Fortnightly Ahmadi,
October, 1953 1st. Fortnight,

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্য্যায়
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

অক্টোবর ১৯৫৩ ইং ; আশ্বিন ১৩৬০ বাং ; তবুক ১৩৩২ সৌর হিজরী

আলাদা জামায়াত গঠন ও আলাদা নমায পড়ার কারণ।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح
الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ ھو النا صر

পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা ভ্রমণকালে আহমদী জমাআত সম্বন্ধে আমাকে অনেক প্রশ্ন করা হইয়াছে। "আহমদী জমাআতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামীয় পুস্তিকায় এই সকল প্রশ্নের কিছুটা জওবাব দিয়াছি। এইবার আহমদী-গণের পৃথক জমাআত গঠন এবং পৃথক নমায পড়ার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

আহমদী জমাআতের সংক্ষিপ্ত বিবরণে উল্লেখ করিয়াছি যে আহমদীগণ খোদার একত্বে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ)কে খাতা-মুন্নবিয়ীন বলিয়া ঈমান রাখেন। কুরআনে করীমকে আল্লার কালাম এবং উহার প্রত্যেক শব্দ, বাক্য ও আদেশ নিষেধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন। উহাকে শেষ শরীয়ত বলিয়া ঈমান রাখেন। ছহী হাদীছের প্রতি একীন রাখেন। নমায পড়েন, রোযা রাখেন, যাকাৎ দেন ও হজ্জ করেন। হাশর নশর, বেহেস্ত ও দুযখের প্রতি অকিদা পোষণ করেন। তাহাদের কার্য্য শুধু ইছলাম প্রচার এবং শত্রুদের আক্রমণ হইতে উহার সংরক্ষণ। সর্ব্বদা তাহারা চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন যেন অন্যান্য ধর্ম্মের উপর ইছলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়; ইছলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্য সকলের নিকট প্রকাশিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহার জন্য নূতন জমাআত গঠন করার কি আবশ্যকতা ছিল? আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে জমাআত বলিতে শুধু সংখ্যাকে বুঝায় না। সহস্র বা লক্ষ কোটি লোককে জমাআত বলেন। যদি লক্ষ লক্ষ লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নমায পড়ে তবে কোন দর্শক কখনও মনে করিবে না যে তাহারা জমাআতের সহিত নমায পড়িতেছে। কিন্তু কোন ইমামের পিছনে একাধিক লোক নমায পড়িলেই ইহাকে জামাআতের নমায বলা হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যাহারা একতাবদ্ধভাবে একই প্রোগ্রাম অনুযায়ী একই নেতার অধীন বিশেষ কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহাদিগকে জমাআত বলে। ইহাতে সংখ্যার কোন প্রশ্ন নাই।

হযরত রছুলে করীম (দঃ) মক্কায় নবুয়তের দাবী করিলেন। প্রথম দিন মাত্র চারিজন লোক তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। তাঁহারা এবং রছুলে করীম (দঃ) এই পাঁচজনই এক জমাআত ছিলেন। কারণ তাঁহারা একই নেতৃত্বের অধীনে কাজ করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইসলাম প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানের ফরজ। ইহাই ইসলামের তরক্কীর সবচেয়ে বড় পথ। ইহার জন্য বিরাট প্রচারক বাহিনী আবশ্যক; প্রচারক গঠনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষায়তন আবশ্যক; ইসলামের সপক্ষে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী বহু নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন, প্রকাশ ও প্রচার করা আবশ্যক; জগতময় বহু প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করা আবশ্যক; এবং এই সকল কাজের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা আবশ্যক। সর্ব্বোপরি এই সমুদায় ব্যবস্থা শৃঙ্খলার সহিত আঞ্জাম দিবার জন্য একজন সর্ব্বমান্য নেতার তত্ত্বাবধানে ইসলামের সেবকগণের পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। মুসলিম দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করুন। একমাত্র আহমদীয়া জামাআত ব্যতীত এইরূপ ইসলাম প্রচারক জামাআত আর একটিও নাই। মুসলিম দুনিয়ায় এইরূপ কোন জামাআত ছিল না। হজরত মীরজা সাহেব তাঁহার অনুগামীদের সমবায়ে এইরূপ একটি জামাআত সৃষ্টি করিয়া মুসলিম জাতির এই বিরাট অভাব পূরণ করিয়াছেন। এই জামাআতের প্রত্যেক ব্যক্তি ইসলামের এক একজন সিপাহী। তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী ইসলামের খেদমত করে। প্রত্যেকেই তাহার আয়ের এক অংশ নিয়মিত চাঁদারূপে ইসলামের সেবায় ব্যয় করে। এই জামাআতের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ইসলামের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ইসলাম প্রচারে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের চেষ্টায় বহু দুর্ব্বল মুসলমানের ঈমান দৃঢ় হইয়াছে এবং বহু অমুসলমান মুসলমান হইয়াছে।

এখনও মুসলমানদের অনেক পার্থিব হুকুমত আছে; ইছলামের নামে নূতন রাষ্ট্র পাকিস্তানও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইসলাম নাম পাকিস্তানের নহে; মিশরের নাম নহে; শাম, এরাক বা আফগানিস্তানেরও নাম নহে। ইছলাম সেই একত্বের বন্ধনের নাম যাহা দুনিয়ার সকল মুসলমানকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল; দুনিয়ার সকল মুসলমানকে একই নেযামের অধীনে পরিচালিত করিয়াছিল। বর্ত্তমানে এই বন্ধন যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলির রাজনীতি এক নয়। প্রত্যেক দেশই নিজেদের রাষ্ট্রে অন্য নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমান নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছে। বর্ত্তমানে খোদার মেহেরবাণীতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে। এতৎসত্ত্বেও পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে এক ইছলামী জমাআত বলা যায়। তাহাদের বিভিন্ন রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে বিভক্ত হইয়া আছেন। তাহাদের সমস্তকে একত্রিত করার বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান নাই। ইছলাম এক জগৎজয়ী মযহব। এই সমস্ত দেশ ও দেশবাসীকে যে জমাত একত্রিত করিতে পারে, তাহাই ইসলামী জামাআত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত এইরূপ কোন জমাআত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত এই কথাই বলিতে হইবে যে দুনিয়ার মুছলমানদের কোন জমাআত নাই। এইভাবে ইহাও বলিতে হইবে যে পৃথিবীতে এমন কোন নেযাম

নাই যাহা পৃথিবীর সকল মুসলমানকে একতাবদ্ধ করার কাজে কৃতকার্য্যতার সহিত অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং এই অবস্থায় যদি কোন জমাআত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্ণিত উদ্দেশ্য নিয়া স্থাপিত হয় তবে কেহ বলিতে পারেনা যে নূতন জমাআত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বরং ইহা বলা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে কোন জমাআত ছিল না, এখন জমাআত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত তিনশত বৎসর হইতে যে শক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছিল সেই শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে এবং বিগত তিনশত বৎসর হইতে মুছলিম জগতে যে শূন্যস্থান পরিলক্ষিত হইতেছিল, আহমদী জমাআত সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াছে। এই পূর্ণতাকে ব্যাপক করিয়া তোলার জন্য আহমদীগণ দুনয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলে আজ আফগানিস্তান, ইরান, এরাক, শাম, মিছর, প্যালেষ্টাইন মস্কত, আদন, সিসিলি, ইটালী, যোগশ্লোভিয়া, হাঙ্গেরী, জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, হলেণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইংলেণ্ড, স্কটলেণ্ড, গোল্ডকোষ্ট, সিরুলিন, নাইজিরিয়া, নিরুবী, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, মরিশাস, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, চিকাগো, পিটাসবার্গ, আর্জেণ্টাইন প্রভৃতি স্থানে আহমদী জমাআত ও প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। মোটের উপর পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে অল্পবিস্তর আহমদী জমাআত আছে এবং সর্ব্বত্রই ইছলামী একতার বীজ রোপিত হইয়াছে। বিভিন্ন মযহব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদী লোক আহমদী জমাতে শামিল হইতেছেন। ঐ সকল দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকেই ইসলামের তরক্কীর জন্য নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেছেন। যেভাবে খোদায়ী জমাআত প্রাথমিক অবস্থায় ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর উপর জয়যুক্ত হইয়া আসিয়াছে, সেইভাবে আহমদী জমাআত সমস্ত দেশে উন্নতি করিতেছে।

একজন সেনাপতি সেই ব্যক্তিগণকেই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে পারেন যাহারা সৈন্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছেন। এইভাবে যদি কোন জমাতের প্রতিষ্ঠা না করা যাইত, তবে আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা অথবা তাহার খলিফাগণ কাহাকে আদেশ দিতেন এবং কাহাদের দ্বারা কার্য্য করাইতেন? যুক্তি ও বিবেক আমাদিগকে এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য করে যে যখনই কোন সুপরিকল্পিত কর্ম্ম করিতে হয় তখন উহা সম্পাদনের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত একটী জমাআত গঠনের আবশ্যক হয় নতুবা কৃতকার্য্যতা লাভ করা কখনও সম্ভব হয় না। জমাআত হিসাবে পৃথক থাকার ফলে জনগণের মধ্যে কৌতুহলের সৃষ্টি হইতে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধানের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে এবং অবশেষে তাহারা এই জমাআত ভুক্ত হইয়া ইছলামের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন। অতএব এইভাবে কার্য্য করাই উচিত ছিল এবং আহমদী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা ইহাই করিয়াছেন।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, আপনারা পৃথক হইয়া নমায পড়েন কেন? কোরআন ও হাদিছের আলোকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)এর দাবী বিচার না করিয়া আলেমগণের অধিকাংশ তাঁহার উপরে কুফরের ফৎওয়া দিয়াছিলেন। যে সকল আলেম তাঁহার দাবী বিচার করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া জমাআতভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কুফরের ফৎওয়া দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কুফরের ফতোয়া দেন নাই এবং কোন আহমদীকে গয়র আহমদীর পশ্চাতে নমায পড়িতে নিষেধ করেন নাই। বরং তিনি নিজেও তাহাদের পশ্চাতে নমায পড়িতেন। এতৎসত্ত্বেও আলিমগণ তাহাদের কুফরের ফৎওয়া দানে দিন দিনই অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। পাঞ্জাব এবং অন্যান্যস্থানে বহু মসজিদে তাহারা লিখিত ফৎওয়া লটকাইয়া দিয়াছিলেন যে এই সমস্ত মছজিদে আহমদীদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোন কোন স্থানে আহমদীগণ মছজিদে গেলে তাহাদিগকে মারপিট করিয়া মছজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে আহমদীগণ বিশেষভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল, জুমুআ এবং জমাআতের নমায হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যে মছজিদে তাহারা নমায পড়িত সেই মছজিদ হইতে অতি অসম্মানের সহিত বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল কয়দুরীবাগের মসজিদে জুমুআর নমায হইতে তাহাদিগকে বিশেষভাবে প্রতিরোধ করা গিয়াছিল। তখন নিরূপায় হইয়া তাহারা মির্জ্জা কাদিয়ানীর নিকট স্বতন্ত্র মসজিদ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ধৈর্য্য ধারণ কর, আমি ছুলেহ করার প্রস্তাব করিয়াছি। যদি ছুলেহ হইয়া যায় তবে পৃথক মছজিদ নির্ম্মাণ করার কোন আবশ্যক হইবেনা। ফল কথা, আহমদীগণ মছজিদ ত্যাগ করে নাই, তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে খোদার ঘর হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

তখন ফেৎনা হইতে বাঁচিবার জন্য হযরত মির্যা সাহেব আহমদীগণকে পৃথক মছজিদ বানাইবার এবং পৃথক নমায পড়ার আদেশ দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে এই ফেৎনার সমাপ্তি ঘটিত না। প্রত্যেক নমাযের সময়েই নমায রাখিয়া মুছল্লিগণ ঝগড়া ফছাদে মত্ত হইয়া পড়িত। অপ্রয়োজনীয় ঝগড়া ফছাদ হইতে বাঁচিবার জন্যই আলাদা নমায পড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। আলেমগণই আহমদীদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া দিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা ফৎওয়া প্রত্যাহার করেন নাই। তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে এখনও ফেৎনা সৃষ্টি করিতেছেন এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা ও কল্পিত আকায়েদ আরোপ করিয়া দেশময় ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক করিতেছেন।

পরস্পরের সমঝোতার জন্য শান্তিময় পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। আলেমগণকে অনুরোধ করুন যেন তাঁহারা লিখিতভাবে আহমদীগণকে বলেন যে তাহারা আহমদীগণের পশ্চাতে নমায পড়িতে প্রস্তুত আছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যে ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছিল উহা তাহারা ফেরৎ লইতেছেন।

প্রিয় ভাইগণ। আপনাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন কি যিনি বলিতে পারেন যে মুছলমানদের কোন বিপদে আহমদীগণ তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করেন নাই? অথবা কোন জাতীয় কার্য্যে আহমদীগণ অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায় হইতে পশ্চাতে রহিয়াছেন? নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে যে ১৯২৩ ইংরেজীতে আগ্রার ত্রিশ হাজার মুছলমান মালকানা রাজপুতকে আর্য্য সমাজীরা শুদ্ধি করতঃ ইছলাম হইতে বাহির করিয়া আর্য্য সমাজভুক্ত করিয়া নিয়াছিল। সেখানে আহমদী জমাআতের শত শত মুবল্লিগ তাহাদিগকে ইছলামে পুনরায় ফিরাইয়া আনয়ণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। বিহারের হাঙ্গামার সময়ও আহমদীয়া জামায়াত বিভিন্নভাবে মুছলমানদের সাহায্য করিয়াছে। তাহারা সদা সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া আসিতেছে যে মুসলমানদের মধ্যে একতা বজায় থাক। মুছলমানের প্রতি সহানুভূতি ও তাহাদের উপকার করার নীতি সকল সময় আহমদীরা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অতীত ইতিহাস আমাদের এই কথার প্রমাণ। এই সম্বন্ধে গয়র আহমদী বিশিষ্ট নেতাগণের সাক্ষ্য হইতে মাত্র দুইটি উপস্থিত করিতেছি। মরহুম মওলানা মুহাম্মদ আলী ছাহেব তাঁহার "হামর্দাদ" নামক উর্দু দৈনিকে ১৯২৭ ইং ২৬শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় বলেন—জনাব মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (আহমদী জমাআতের বর্ত্তমান ইমাম) এবং তাঁহার সঙ্ঘবদ্ধ জমাআতের উল্লেখ না করা অকৃতজ্ঞতা হইবে; তিনি তাঁহার সমস্ত মনোযোগ মুছলমানগণের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। "মশরিক" পত্রিকা ১৯২৭ ইং ২২শে সেপ্টেম্বরে লিখিয়াছেন "জমাআতে আহমদিয়ার ইমাম (হজরত মির্জা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ) ছাহেবের অনেক এহছান সমগ্র মুসলমান জাতির উপর রহিয়াছে। তাঁহারই প্রচেষ্টায় হিন্দু পরিচালিত পত্রিকা "বর্ত্তমানের" উপর মুকদ্দমা দায়ের করা গিয়াছিল। এই পত্রিকা হযরত নবী করীম (দঃ)এর বিরুদ্ধে অতি জঘন্য অশ্লীল কথা প্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহারই জমাআত "রঙ্গিলা রছুলের" মুকদ্দমা চালাইয়াছিল এবং জেলে যাইতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাঁহারই লিখিত পুস্তিকা পাঞ্জাবের গভর্ণরকে সুবিচার করার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। মোটের উপর

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মুসলমানদের যত সম্প্রদায় আছে তাহারা কোন না কোন কারণে ইংরেজ অথবা হিন্দু অথবা অন্য কোন জাতির প্রভাবে ভীত হইয়া পড়িতেছে। শুধু এক আহমদী জমাআতই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মত কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রভাবে ভীত নহে এবং বিশুদ্ধ ইছলামী কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।" অমুছলমানগণও আহমদীয়াদের ইসলামের খেদমত দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ভয় করিতেছেন যে এই সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় ইসলাম তাহাদিগকে জয় করিয়া নিবে। (১৯২৭ ইং ১৮ই সেপ্টেম্বরের "বন্দেমাতরম" পত্রিকা দ্রষ্টব্য)।

পরিশেষে বিনীত নিবেদন করিতেছি, বিশুদ্ধ মনে আল্লার নিকট দোয়া করুন—"হে আল্লাহ যদি আহমদী জমাআত সত্য হইয়া থাকে তবে তাহাতে যোগদানের তওফিক দাও যেন কিয়ামতের দিন আমরা দায়ী না হই।

নিবেদক—**রহমত আলী**

রইছুল মুবল্লিগীন, পূঃ পাঃ আহমদীয়া আঞ্জুমান।

অনুবাদক—মুমতায আহমদ (মুবল্লিগ)

[বিস্তারিত জানিবার জন্য আহমদীয়তের পয়গাম পাঠ করুন এবং আমাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করুন।]

হযরত মোহাম্মদ (দঃ)

[মুমতায আহমদ]

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা,—এই মহাদেশ ত্রয়ের সঙ্গমস্থলে, আরব দেশের মক্কা নগরে, কুরেশ বংশের বনুহাশিমগোত্রে, হযরত আবদুল্লার ঔরষে, হযরত আমেনার গর্ভে, পাঁচশত সত্তর খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে, রবিউল আউয়াল চান্দ্রমাসের শুক্ল দ্বাদশীতে, সোমবার সুবেহছাদিকের সময়, রহমতুল্লিল আলামিন খাতামুন্নবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (দঃ) আধ্যাত্মিকতার আমানিশা ভেদ করিয়া ছিরাজুম মুনিররূপে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মদ।

তদানিন্তন জগতের অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ বলিতেছেন "যাহারাল ফছাদু ফিল বররে ওলবাহরে বিমাকাছাবাত আইদিন্নাছ—জলে ও স্থলে ধর্ম্মযাজক ও জনগণের মধ্যে তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে"।

নাস্তিকতা, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, বহুত্ববাদ, পিতৃত্ববাদ, পুত্রত্ববাদ, নরহত্যা, নরবলি, সতীদাহ, দেবতার উদ্দেশ্যে সাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, আভিজাত্যাভিমানে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত সমাধিদান, মিথ্যা কথন, সুরা পান, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, গণিকাবৃত্তি, জুয়া, সুদ, লুণ্ঠন, অপহরণ, উৎপীড়ন, শোষণ, কুশাসন প্রভৃতি অনাচারের তাণ্ডব নৃত্য ধরণীময় পরিব্যাপ্ত ছিল। মানবাত্মা মুক্তিদাতার আগমণের নিলিত্ত আকুল আর্ত্তনাদ করিতেছিল। আল্লাহ মানবতার ক্রন্দন রোল শ্রবণ করিলেন। তাহার ছিফতে রবুবিয়ত উৎসারিত হইয়া উঠিল। বিশ্ব-সংস্কারের জন্য তিনি বিশ্ব নবীকে অবতীর্ণ করিলেন।

"ওমা-আরছালানা কা ইল্লা রহমাতাল্লিল আলামীন—হে মহাম্মদ, আমরা তোমাকে জগদ্বাসীর জন্য মূর্ত্তিমান করুণারূপেই প্রেরণ করিয়াছি"। বীজের মধ্যে যেরূপ বৃক্ষ হওয়ার যোগতা বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)এর প্রকৃতিতেও বিশ্বনবীত্বের যোগ্যতা বিরাজমান ছিল।

আঁ হযরতের জীবন জগৎ জনগণের প্রতিচ্ছবি।

চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশী বিষে দংশেনি যারে।

হযরত মুস্তফা মাতৃগর্ভে থাকিতেই পিতৃহীন হন। ছয় বৎসর তিনি মাতৃ স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন। আট বৎসর বয়সের সময় পিতামহ আবদুল মুত্তালিবেরও মৃত্যু হয়। তখন পিতৃব্য আবু তালিবের স্নেহে লালিত পালিত হইতে থাকেন। তাঁহার জন্ম, শৈশব, বাল্য ও কৈশোর পিতৃ বাৎসল্য ও মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত সর্ব্বহারাগণের প্রতিচ্ছবি। ভবিষ্যৎজীবনে তিনি তাহাদের আশ্রয় কেন্দ্র।

তৎকালে আরব দেপে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না। তিনি বাল্যকালে ছাগ চরাইতেন। অন্যান্য বালক বালিকাদের মত অযথা খেলাধূলায় কাল যাপন করিতেন না। যৌবনে বাণিজ্য করিতেন। অপর লোকদের মত অন্যায় আমোদ প্রমোদ, নৃত্যগীত, দ্বন্দকোন্দল অযথা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতেন না।

পঁচিশ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স্কা সতীসাধ্বী, ধনবতী বিধবা খদিজা (রাঃ)র পানি গ্রহণ করেন। বৈবাহিক জীবনে পতিহারা, বিয়োগ বিধুরা ললনাগণের প্রতি তাঁহার সান্ত্বনা দানের মহান আদর্শ জাগরূক রহিয়াছে।

সতীকুলোত্তমা তাঁহার সমগ্র সম্পদ মুস্তফা চরণে বিলাইয়া দিলেন। আঁ হযরত সর্বপ্রথমেই সকল দাসদাসীকে মুক্তি দান করিয়া জগতে দাসত্ব প্রথা বিলোপের প্রথম ও প্রধান আদর্শ স্থাপন করেন। মানুষ একমাত্র আল্লার দাসত্ব করিবে। সে অপরের দাসত্ব করিতে পারে না। অপরকে দাসরূপে ব্যবহার করা কার্য্যতঃ খোদায়ী দাবীরই নামান্তর মাত্র।

দাস দাসীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার এত কোমল, এত স্নেহপূর্ণ ও করুণাবর্ষী ছিল যে মুক্তি দানের পরও বিশ্বস্ত ক্রীতদাস হযরত যায়দ (রাঃ) মুস্তফা চরণে আত্ম নিবেদন করিলেন। পিতা পিতৃত্বের আবেদন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই! মাতার করুণ অনুরোধের কাহিনী শুনিয়াও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার স্নেহনীড় হইতে নড়িবার ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করেন নাই। এই কারণেই আঁ হযরত তাঁহাকে জনগণের সাক্ষাতে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন।

আঁ হযরত জগতের লাঞ্ছিত দলিত জনগণের মুক্তিদানের উত্তম আদর্শ।

হযরত মুস্তফা জনগণের অধঃপতন দেখিয়া দিনরাত ব্যথিত চিত্তে কালযাপন কয়িতেন। তিনি নির্জ্জনতা প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মক্কার হেরা নামক পর্ব্বত গুহায় বসিয়া দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ আল্লার ধ্যানে কাটাইয়া দিতেন। তিনি জীবনে সব সময় পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করিতেন। চল্লিশ বৎসর বয়ক্রমকালে আল্লাহ তাহার উপর প্রথম অহী নাযিল করিলেন—"ইক্‌রা বিছমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক, খালাকাল ইনছানা মিন আলাক, ইকরা ও রাব্বুকাল আকরমুল্লাযি আল্লামা বিল কলম, আল্লামাল ইনছানা মালাম ইয়ালাম—হে মুহাম্মদ, তোমার প্রভুর নাম লইয়া পাঠ কর যিনি সর্ব্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন; মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন রক্তপিণ্ড হইতে। তুমি পাঠ কর তোমার সেই মহান প্রভুর নাম লইয়া যিনি লেখনীর সাহায্যে জ্ঞান দান করিয়াছেন; তিনি মানবকে এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে যাহা সে অবগত ছিল না।"

এই বাক্যসমূহে আল্লাহ মানব জাতিকে লিখা পড়ার সাহায্যে জ্ঞান দান করার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিরক্ষর ছিলেন। তাঁহার নবী জীবনের প্রথম অহী মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যের আহ্বান।

আল্লাহ তাঁহাকে অনাচাররূপ অন্ধকার হইতে জনগণকে বাহির করিয়া সত্য ও সততার আলোকের দীয়া নিয়া আসার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। "কাদ আনযালাল্লাহু ইলাইকুম যিকরান রছুলান ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতিল্লাহে মুবায়িনাতিন লে ইউখরিজাল্লাজিনা আমানু ও আমিলুছছালিহাতে মিনাযযুলুমাতে ইলান্নূর—হে বিশ্ব মানব! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি উপদেশক রছুল অবতীর্ণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদের নিকট আল্লার বিশদ বিবৃতিকারী বাক্যমালা পাঠ করেন যেন সমাগত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাহারা সাধনারত হইয়াছে তাহাদিগকে তিনি অন্ধকার রাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে নিয়া আসেন"।

আরব জাতির মধ্যে সুরা পানের স্রোত প্রবলভাবে প্রবাহিত ছিল! কিন্তু

আঁ হযরতের পবিত্র ওষ্ঠাধর সর্ব্ব পাপের জননী সুরাকে বাল্যকাল হইতে কখনও স্পর্শ করে নাই। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক মেরুদণ্ড চূর্ণকারী এই মহারাক্ষসী সুরাকে ধর্ম্মতঃ নিষিদ্ধ করিয়া মানবতার প্রতি তিনি অফুরন্ত কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন। নারীর জন্য উত্তরাধিকার নীতির প্রচলন, সুদ প্রথার বিলোপ সাধন, যাকাৎ, উশুর, ছদকাত ও নানাবিধ দান খয়রাতের বিধান করতঃ ধন বণ্টনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন।

প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জ্জনের স্বকীয়তা বহাল রাখিয়া মানব বুদ্ধির উন্মেষের পথকে উন্মুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন। পর্দ্দা প্রথার প্রচলন পূর্ব্বক ব্যাভিচারের পথকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কন্যাসন্তানের পিতামাতাকে বেহেস্তের শুভ সংবাদ দান করিয়া কন্যাসন্তানের মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নারী অর্দ্ধাঙ্গিনী, শান্তিদায়িনী; মাতার চরণতলে সন্তানের বেহেস্ত; এই অমিয় বাণী দ্বারা নারী জাতির মহিমাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ক্রীতদাসীকে মুক্তি দান করিবে, অতঃপর বিবাহ করিবে, সে দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হইবে। এই মহাবাক্যে দাসদাসীর প্রতি মানবীয় সমতার নীতি বিঘোষিত করিয়াছেন। জগতের প্রত্যেক জাতিতে নবী আসিয়াছেন, আল্লার এই বাণী দ্বারা জগতের সকল জাতিকে আল্লার নিয়ামত পাওয়ার যোগ্যতা-সম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সকল নবীই সমান তাহাতে কোন ভেদাভেদ নাই; এই বাণী দ্বারা জাতিমালার মধ্যে মিত্রতার সূত্র স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব ধর্ম্ম ও সর্ব্ব জাতির সমন্বয়ে মহা জাতি গঠন করিয়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ মুছলিম উম্মত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহারা বিশ্বমানবের জন্য হইবেন আদর্শ এবং মহানবী মুস্তফা হইবেন মুছলিম উম্মতের আদর্শ। এইভাবে পৃথিবীর যাবতীয় অনাচারের অন্ধকার দূর করিয়া সত্যের আলোর দিকে নিয়া আসার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রাথমিক মুসলমানগণ অমিত তেজ, অদম্য উৎসাহ ও মহাসাধনার সহিত তাহাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা অর্দ্ধ পৃথিবীব্যাপীয়া শান্তিপূর্ণ সুশাসনের প্রচলন করিতে পারিয়াছিলেন।

ভোগ বিলাসে মত্ত ও কর্ত্তব্য চ্যুত হওয়ার দরুণ পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিদের ন্যায় মুসলমান জাতিরও পতন হইবে, এই সতর্ক বাণীর সহিত মছীহ মাহদীর আগমণে তাহাদের পুরুত্থানের শুভসংবাদও তিনি দিয়াছেন। তাঁহার তের শত বৎসর পর মছীহ মাহদীর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করিয়াছেন। তখন একই রমযান চান্দ্র মাসের ১৩ই তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮শে তারিখে সূর্য্য গ্রহণ হওয়াকে মাহদীর আগমণের নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাই সেই শুভসংবাদিত যুগ। ১৩০০ বাংলা সন, ১৮৯৪ ইংরাজী সন এবং ১৩১১ হিজরী সনের রমযান চান্দ্র মাসের বর্ণিত নির্দ্ধারিত তারিখে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ লাগিয়া মছীহ মাহদীর আগমণ বার্ত্তা জগতের বিভিন্ন জাতিমালার মধ্যে ঘোষণা করিয়াছে। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার কাদিয়ান গ্রামে তাঁহার পুণ্য ধাম এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁহার প্রিয় নাম।

হযরত মছীহের (আঃ) কিতাব হইতে।

['ফতেহ্ ইসলাম' হইতে উদ্ধৃত]

এস্থলে আমি একথা প্রকাশ করা উচিত মনে করি যে, যত লোক আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা সমস্ত এখনো এরূপ যোগ্য হয় নাই যে, তাহাদের সম্বন্ধে কোন উত্তম অভিমত প্রকাশ করিতে পারি, বরং কেহ কেহ শুষ্ক শাখার ন্যায় দৃষ্ট হয়। তাহাদিগকে আমার অভিভাবক প্রভু আমা হইতে কাটিয়া জ্বালানি কাষ্ঠে পরিণত করিবেন। কেহ কেহ এমনো আছে যে, প্রথমতঃ তাহাদের মধ্যে হৃদয়ের আবেগ ও আন্তরিকতাও ছিল, কিন্তু এখন তাহাদের মধ্যে কঠোর 'কব্জ্' বা বিরাগ-ভাব দেখা দিয়াছে এবং আন্তরিকতার আবেগ এবং শিষ্যোচিত প্রেমের জ্যোতিঃ আর তাঁহাদের মধ্যে নাই, কেবল 'বাল-আমের' ন্যায় প্রবঞ্চনাই বাকী রহিয়াছে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের ন্যায় মুখ হইতে উৎপাটিত হইয়া পদতলে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া এখন আর কোন কাজের যোগ্য তাহারা থাকে নাই। তাঁহারা ক্লান্ত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে এবং তুচ্ছ দুনিয়া তাহাদিগকে আপন সর্ব্বগ্রাসী ফাঁদে জড়িত করিয়া লইয়াছে। অতএব আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, তাহারা শীঘ্রই আমা হইতে কর্ত্তিত হইবে, তবে সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবে যাহার হস্ত খোদাতা'লার ফজল বা অনুগ্রহ নূতনভাবে ধরিয়া লইবে। এরূপ লোকও অনেক আছেন যাঁহাদিগকে খোদাতা'লা চিরকালের জন্য আমাকে দিয়াছেন এবং তাহারা আমার অস্তিত্ব রূপ বৃক্ষের সবুজ শাখা। আমি অন্য কোন সময়, ইনশা-আল্লাহ, তাহাদের কথা বর্ণনা করিব।

এস্থলে আমি এরূপ কতিপয় লোকের হৃদয়ের প্ররোচনাও দূর করিতে চাই যাহারা সঙ্গতিশালী লোক এবং নিজদিগকে বড়ই দাতা এবং ধর্ম্মের পথে আত্মবিলীনকারী মনে করে, কিন্তু নিজেদের অর্থ যথাস্থানে খরচ করিতে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ। তাহারা বলে, "আমরা যদি খোদাতা'লার তরফ হইতে ধর্ম্মের সাহায্যার্থ আগমনকারী কোন সত্য 'মুওয়াইদ-মিনাল্লাহ্' বা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত পুরুষের জমানা পাইতাম তবে আমরা তাঁহার সাহায্যার্থ এরূপ ভাবে অগ্রসর হইতাম যেন কোরবাণী (বলি) হইয়া যাইতাম; কিন্তু কি করিব, চতুর্দ্দিকে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার বাজার গরম হইয়া আছে।" কিন্তু হে লোকগণ! তোমাদের নিকট প্রকাশ থাকে যে, ধর্ম্মের সাহায্যের জন্য এক ব্যক্তি প্রেরিত হইয়াছেন, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে চিন নাই। তিনি তোমাদের মধ্যেই আছেন এবং তিনি সেই ব্যক্তিই যিনি এখন কথা বলিতেছেন। কিন্তু তোমাদের চক্ষে পুরু পর্দ্দা পড়িয়া আছে। তোমাদের হৃদয় যদি প্রকৃতই সত্যান্বেষী হইয়া থাকে তবে যে ব্যক্তি খোদার সহিত বাক্যালাপকারী হইবার দাবী করেন তাঁহার দাবী পরীক্ষা করা অতি সহজ। তাঁহার নিকটে আস, তাঁহার সাহচর্য্যে দুই তিন সপ্তাহ থাক, যেন খোদা চাহে-তো, সেই ঐশী 'বরকত' বা আশীষ যাহা তাঁহার উপর বর্ষিত হইতেছে এবং সেই সত্য ঐশী-বাণীর জ্যোতিঃ যাহা তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ হইতেছে তাহার কতকটা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিতে পার। যে অনুসন্ধান করে সে-ই পায়; যে দ্বারে আঘাত করে তাহার জন্যই দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। যদি তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকিয়া বল,—"সূর্য্য কোথায়?" তবে ইহা তোমাদের বৃথা আপত্তি হইবে। হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! প্রকোষ্ঠের দ্বার খুল এবং চক্ষু হইতে পর্দ্দা অপসারিত কর, যেন সূর্য্য তোমাদের দৃষ্টিগোচরও হয় এবং নিজ জ্যোতিতে তোমাদিগকে জোতির্ম্ময়ও করে।

কেহ কেহ বলে যে, আঞ্জোমন প্রতিষ্ঠিত করা এবং মাদ্রাসা স্থাপন করাই ধর্ম্মের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। তাহারা জানে না ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এবং জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি এবং কেমন করিয়া সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাহাদের জানা উচিত, এই জীবনের মূল উদ্দেশ্য খোদাতা'লার সহিত সত্যিকার ও সুনিশ্চিত সংযোগ স্থাপন করা। ইহা মানুষকে প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া মুক্তির উৎসে পৌছাইয়া দেয়। পূর্ণ একীন বা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের এই পথ মানবীয় চেষ্টা তদবীরে কখনো উন্মুক্ত হইতে পারে না। মানুষের গড়া দর্শন এস্থলে কোন কাজে আসে না। খোদাতা'লা সর্ব্বদাই তাঁহার বিশিষ্ট বান্দাগণের সাহায্যে অন্ধকারের সময় আকাশ হইতে এই জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করেন। যিনি আকাশ হইতে অবতরণ করেন তিনিই আকাশে লইয়া যাইতে পারেন। অতএব হে অন্ধকার কূপে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ, সন্দেহের কবলে বন্দিগণ এবং প্রবৃত্তির

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইসলামে নারীর স্থান

মোহম্মদ মোস্তাফা আলী

[ফাল্গুন, ১৯৫৯ সালের 'মাসিক মোহাম্মদী' হইতে উদ্ধৃত]

সৃষ্টির কোন কিছুই অর্থহীন নয় বলে বিশ্ব-প্রকৃতিতে প্রত্যেক সৃষ্টিরই একটা স্থান আছে। জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপক্ষী, ধূলাবালি ইত্যাতি সৃষ্টিতে নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করে বসে নেই; প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করে চলেছে; বরং কর্ত্তব্য ও দায়িত্বপালনের ভিতর দিয়েই প্রকৃতিতে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে। তাই প্রকৃতির যে কোন সৃষ্টিই স্থানচ্যুত হলে বা ইহার কর্ম্মধারায় অহেতুক বাধা সৃষ্ট হলে বিশ্ব-প্রকৃতিতে বিপর্য্যয় সৃষ্টি হওয়ারও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্যকে একটু তলিয়ে দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষই ইহার সেরা সৃষ্টি। মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলার জন্যই যেন প্রকৃতির এতো আয়োজন, এতো সমারোহ।

এখনে মানব অর্থে শুধু নারী বা পুরুষকে বুঝায় না—নারী-পুরুষের সমন্বয়ে যে মানবতা, ইহাকেই বুঝায়। সুতরাং বিশ্ব-প্রকৃতিতে নারী ও পুরুষের স্থান যে পাশাপাশি, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই বলে নারী ও পুরুষ একই স্থান অধিকার করে আছে ধরে নিলে ভুল করা হবে। প্রাকৃতিক বিধানে কখনও নারী বড়, কখনও পুরুষ; আবার কোথাও বা উভয়েই সমান।

প্রকৃতিতে গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী ইত্যাদি সমষ্টিগতভাবে যেমন একটা স্থান অধিকার করে আছে—আবার প্রত্যেকটি সৃষ্টিই ব্যষ্টি হিসেবেও একটা স্থান দখল করে আছে। সামাজিক জীব বলে মানুষের বেলায় নারী ও পুরুষের সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত স্থান অধিকারের মূল্য প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্টি হতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, ভাষা ইত্যাদি মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠস্থান অধিকারের যোগ্য করেছে। তাই নিজস্ব প্রতিভার বলে নারী ও পুরুষ উপরোক্ত গুণাবলীর বিকাশ সাধনে যতদূর সফলকাম হয়, ব্যষ্টি হিসেবে সমাজব্যবস্থায় সে তার স্থানও তত উচ্চে নির্দ্দিষ্ট করে নেয়।

এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হলো: সমষ্টিগতভাবে ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। যে সমাজব্যবস্থা প্রকৃতির সাথে যত বেশী খাপ খাওয়াতে পারবে, সে সমাজব্যবস্থাই মানবতার জন্য তত মংগলের হবে এবং ততখানি সফলতা লাভ করবে।

আলোচনার সুবিধার জন্য নারী জীবনকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হচ্ছে।

প্রথমতঃ, বিবাহের পূর্ব জীবন (কুমারী জীবন),—যখন সে মা-বাপের ছায়া-তলে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, বিবাহিত জীবন—অর্থাৎ স্ত্রীরূপে নারী।

তৃতীয়তঃ, মাতৃজীবন—অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘরসংসারের জীবন।

নারী জীবনের এই তিনটি প্রধান দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

হযরত মোহম্মদ (ছাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি দুইটি মেয়েকে সাবালিকা না হওয়া পর্য্যন্ত লালন-পালন করে, আমি ও সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস একত্রিত উত্থিত হইব।" তিনি পরস্পর দুইটি অঙ্গুলী একত্রিক করিয়া দেখাইলেন। [মোসলেম]

যদি কাহারো তিন মেয়ে হয় এবং তাহাদের দরুন কোন প্রকার চাঞ্চল্য অনুভব না করে, এবং স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী তাহাদিগকে উত্তম বস্ত্র দেয়, তবে তাহারা দোজখের আগুন হইতে তাহার রক্ষা লাভের কারণ হইবে।"

[আন্-আদাবুল-মুফরাদ]

ইহাতে মেয়েদের লালন-পালন করার উপর তিনি যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন ইহার তুলনা মিলা ভার। মেয়েদের লালন-পালনে ও শিক্ষার এতো গুরুত্ব দেওয়ার উপরে হয়ত অনেকে এত্রাজ করে বসবেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে, হযরত রছুলে করীম (ছাঃ) অযথা কথা বলেন নি। কথায় বলে—"সংসার সুন্দর হয় রমণীর গুণে।" যে মাতা-পিতা দুটি বা তিনটি মেয়েকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করে পরবর্তী দু' তিনটি পরিবারের সুখ ও সৌন্দর্য্যের পথ করে দিলেন, যাদের কল্যাণে তৎপরবর্তী আরো বহু পরিবার ক্রমাগতভাবে উপকৃত হতে থাকবে, সেই পিতামাতা পরকালে রছুলে করীম (ছাঃ)এর সাথী হবেন তাতে আর বিচিত্র কি? মেয়েকে লালন-পালনের মধ্যে ত্যাগ আছে। সমাজ ও জাতিগঠনে ত্যাগের স্থান অতি উচ্চে।

বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানসাধনা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রয়োজনীয়। তাই ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই এইজন্য সমভাবে তাগিদ দিচ্ছে। শিশুকাল হতেই পিতামাতা এদিকে সজাগ দৃষ্টি না দিলে সন্তানের মনুষ্যত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নারী ও পুরুষ উভয়ে মিলে সংসার গড়তে যায়। কিন্তু যাত্রার প্রারম্ভেই নারী ত্যাগের যে আদর্শ স্থাপন করে, তা চিন্তাশীল ও দরদী হৃদয়কে অভিভূত না করে পারে না। আজ যে নারী ও পুরুষ বিবাহ বন্ধনকে স্বীকার করে সংসার যাত্রায় পা বাড়াল, তারা হয়ত অচেনা অজানাভাবে দুটি পারিপার্শ্বিকতায় লালিত পালিত হয়েছে। কিন্তু বিবাহের পরমুহূর্ত্তেই নারী তার প্রাণ প্রিয় মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠিনী, সহচরী, বাড়ীঘর, আশেপাশের গাছপালা, স্বহস্তে প্রতিপালিত হাস-মুরগ সবকিছু হতে নারীর সম্পর্ক, স্নেহের ডোর, ভালবাসার বাঁধন, মনের টান সবকিছু ছিন্ন করে দিয়ে চলে অজানা অচেনা পথে—পাথেয় শুধু তার একটি পুরুষ—যাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলবে তায় সুখের নীড়। যে পুরুষ নারীর এই ত্যাগের নিকট নতি স্বীকার করে না—সে তার হৃদয়-হীনতার পরিচয় দেয়। পুরুষ যদি নারীর এই ত্যাগের কথা ভেবে নতুন যাত্রাপথে পা বাড়ায়, তবে দাম্পত্য জীবন অনেকখানি সুখের হয়ে উঠবে। অপর দিকে যে নারী তার সহযোগীর জন্য প্রথমেই এতবড় ত্যাগ স্বীকার করে, তাকে দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকাই উচিত। নতুবা বিবাহের প্রথম মুহূর্ত্তেই নারী ত্যাগের যে মহান আদর্শ স্থাপন করে, ইহাকে নিজ হাতেই মলিন করে দেওয়া হবে।

ইসলাম দাম্পত্য জীবনের যে ছবি এঁকেছে, তা সমাজ জীবনে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলে নারী তার প্রকৃত স্থান ও অধিকার হতে কখনও বঞ্চিত হতে পারেনা।

স্ত্রীগণ তোমাদের পোষাকস্বরূপ
এবং তোমরা তাহাদের পোষাকস্বরূপ।" [ছুরা বকর—১১৮]

পোষাক দ্বারা সাধারণতঃ তিনটি কাজ হয়ে থাকে; লজ্জানিবারণ, শীতাতপ হতে দেহকে রক্ষা, ও দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি। সেরূপ স্বামী স্ত্রী হতে এবং স্ত্রী স্বামী হতে মংগল গ্রহণ করতে সচেষ্ট হলে, দাম্পত্য জীবন নিশ্চয়ই মধুর হয়ে ফুটে উঠবে। দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে একে অন্যকে গ্রহণ করতে হবে। একে অন্যকে দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন হতে রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। একে অন্যের ছোটখাটো দোষত্রুটী ঢেকে রেখে শোধরাবার চেষ্টা করলে তাদের জীবন দিন দিন সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে।

কোরআন করিম বলেছে:—

"স্ত্রীগণ তোমাদের ভূমিস্বরূপ।" [ছুরা বকর—২২৪]

কয়েকটি মাত্র কথায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যকে এমন সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়েছে যাহা অতুলনীয়। জমি হতে সুফসল পেতে হলে যেমন সময়মত চাষ করে, ভাল বীজ বুনতে হয় এবং ফসলের হেফাজতের জন্য সর্ব-প্রকারের চেষ্টা করতে হয়, তেমনই দাম্পত্য জীবন হতে সুসন্তানের ফসল কুড়াতে হলেপ অনুরূপভাবে আমাদের সজাগ ও সক্রীয় দৃষ্টি রাখতে হবে। যৌনজীবন ও দাম্পত্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এখানে প্রয়োজনীয় ইংগিত রয়েছে। বৈধ অধিকার ব্যতীত জমিতে চাষ করতে গেলে যেমন সমাজে নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়, তেমনি অবৈধ যৌন-সংযোগও সমাজে নানা অনর্থের কারণ হয়ে থাকে।

ইসলাম বিবাহের বেলায় নারীর নিজস্ব মত প্রয়োগের অধিকার দিয়েছে। পুরুষকে যেমন তালাকের অধিকার দিয়েছে,—নারীকেও 'খোলা'র অধিকার দিয়েছে। এ সকল নির্দ্দেশের মধ্যে যে ইতরবিশেষ দেখা যায়, তার প্রত্যেকটির পেছনে যুক্তিসংগত ও প্রকৃতিগত কারণ রয়েছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে বিবাহের প্রধান ও একটা প্রাথমিক শর্তরূপে মোহরানার নির্দ্দেশ দিয়ে কোরআন করীম একটা মৌলিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে।

যৌনমিলনের আনন্দ, ভোগ, উপভোগ নারী-পুরুষ উভয়েরই হয়ে থাকে—তবে মোহরানার বোঝা চাপিয়ে পুরুষের উপর এত জুলুম কেন?—এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক কিন্তু এ প্রশ্নেরও সমাধান মিলে। যৌনমিলনের পরবর্তী ফল নারী ও পুরুষের উপর একরূপ হয় না। যৌনমিলনের পর পুরুষ যেখানে মুক্ত, নারী সেখানে কতকগুলি নূতন দায়িত্ব এবং তার স্বাস্থ্যের উপরে কতকগুলি বিপদ নিয়ে আসে—ইচ্ছা করলেও যাহাতে পুরুষ কোন ভাগ নিতে পারে না। তাই মোহরানা দ্বারা নারীকে কতকটা বাস্তব সাহায্য করার পথ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে অন্য কোন উপায়ে সাহায্য করা যায় না, সেখানে আর্থিক সাহায্য করা একটা স্বীকৃত সামাজিক ব্যবস্থা। তা ছাড়াও অবশ্য মোহরানার সপক্ষে আরো বহু যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে।

হাদিছে আছে:

"যদি কোন মানুষকে সেজদা করা বিধিসংগত হইত, তা হলে মেয়েলোক-দিগকে বলিতাম, তাহারা যেন আপন স্বামীকে সেজদা করে—যেহেতু আল্লাহ-তায়ালা পুরুষের দাবী নারীর উপরে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।"

[আহমদ—আবু দাউদ]

অনেক স্বামীই হযরতের এই হাদিছটি আওড়ায়ে স্ত্রীর নিকট হতে অযথা ফায়দা উঠাতে চায়। তারা যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, স্ত্রীকে তা অম্লানবদনে মেনে নিয়ে স্বামীর সেবা করতে হবে—কারণ স্বামীর স্থান যে স্বয়ং খোদারই নীচে! কিন্তু এই হাদিছ দ্বারা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অকুণ্ঠ আনুগত্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মহান দায়িত্বের প্রতিও ইংগিত রয়েছে। যিনি খোদার নীচেই স্থান অধিকার করে বসে আছেন, তাঁকে তাঁর স্ত্রীর প্রতি খোদাসদৃশ ব্যবহারও দেখাতে হবে। খোদা যাকে যত উচ্চ করেছেন, তাঁর দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যও তত বেশী হওয়া চাই। সারা মাখলোকাতের প্রতি খোদার গুণের বিকাশ হচ্ছে—স্বামীকে অন্ততঃ তার স্ত্রীর প্রতি যথাসম্ভব খোদায়ি সিফতের বিকাশ দেখাতে হবে; তবেই তার উচ্চাসনের মর্য্যাদা রক্ষা পাবে। "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করে, তোমাদের মধ্যে আমি সর্ব্বোত্তম যেহেতু তোমাদের ব্যবহারের চেয়ে পরিবারের প্রতি আমার ব্যবহার সর্ব্বোত্তম।"

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আরো কয়টী কথা স্মরণ রাখলে আমাদের দাম্পত্য জীবন ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠবে।

আদি মানব দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়েই বেহেস্তে ছিলেন, এই সম্পর্ক নিয়েই তাঁদেরকে সেখান হতে বিদায় হতে হয়েছিল। এই সম্পর্কের ভিতর দিয়েই আমরা এ মরজগতকে জান্নাতে রূপান্তরিত করতে পারি। হয়ত মর্ত্যকে স্বর্গের রূপ দেওয়ার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে আদম (আঃ) ও হাওয়া নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যেক দম্পতিই আদম ও হাওয়ার স্থান অধিকার করে আছে! হাজার হাজার বৎসরে যেমন আদম ও হাওয়ার সন্তানে সমগ্র দুনিয়া ভরে উঠছে, তেমনি যে কোন দম্পতির জুরিয়াতে তা হতে পারে—দাম্পত্য জীবনের এই সীমাহীন সম্ভাবনার কথা হৃদয়ংগম হলে স্বামী-স্ত্রী কখনও দায়িত্বহীন হতে পারে না।

মা হিসাবে সন্তানের সাথে নারীর সম্পর্ক পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। যৌন-মিলনের পরমুহূর্ত্তেই বাপের মৃত্যু হলে সন্তানের জন্ম হতে পারে—এমন কি ঐসন্তান দ্বারা দুনিয়া আলোকিত হতে পারে। কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় মা'র মৃত্যু হলে সন্তানের জন্মই হতে পারে না। গর্ভসঞ্চারে মা-বাপ দুজনেরই সম-প্রয়োজন হলেও পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে মার দানই বেশী। মা সন্তানকে দীর্ঘকাল গর্ভে ধারণ করেন, মার শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ী, রক্তপ্রবাহ প্রত্যেকটীর সাথে সন্তানের হয় প্রত্যক্ষ সংযোগ। এসকল বন্ধন ছিন্ন করে সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখনও তার লালন পালনের ভার পড়ে মারই কাঁধে। মানব শিশু যত অসহায় অবস্থায় জন্ম নেয়, অন্যান্য জীবজন্তুর সন্তান তত অসহায় থাকে না। মার বুকের দুধ খেয়ে, তার অপার স্নেহে লালিত পালিত হয়েই মানব শিশুর অসহায়ত্ব ধীরে ধীরে ঘুচতে থাকে। এইখানেই শেষ নয়। মানব শিশুকে মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য যে শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন, ইহার প্রাথমিক কাজও মার হাতেই আরম্ভ হয়। সন্তানের বুলি ও ভাষা হতে আরম্ভ করে ভবিষ্যৎ পূর্ণতার বীজও মার হাতেই রোপিত হয়। মার শিক্ষা শিশুর মনে যে দাগ কেটে দেয়, তা সহজে মুছে না। তাই হযরত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন—

"তাঁহারই (মার) পদতলে স্বর্গ।" [আহমদ-নাছাই শরীফ]

ইহার সহজ অর্থ ভক্তিশ্রদ্ধা এবং সেবাশুশ্রূষা দ্বারা মাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই বেহেস্তের অধিকারী হওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া এই হাদিছটীর একটা নিগূঢ় অর্থও আছে। মার নিকট হতে শিশু যে শিক্ষা পায়, ইহা দ্বারা তার পরবর্তী জীবন বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। বলতে গেলে মার হাতেই সন্তানের চরিত্র গঠনের ভিত্তির স্থাপিত হয়। অপর দিকে চরিত্রগুণেই বেহস্ত অর্জিত হয়ে থাকে, এমন কি পুণ্যচরিত্র ব্যক্তিগণ জাগতিক জিন্দিগিকেই বেহেস্তে রূপান্তরিত করে থাকেন। বস্তুতঃ যে মা সন্তানের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ করে থাকেন, সে মা নিশ্চয়ই অসৎ শিক্ষা দ্বারা সন্তানের ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক অমংগল সাধন করে তার বেহেস্তে পথ রুদ্ধ করে দিতে পারেন না। যদি কোন মা তাহা করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি সন্তানের প্রকৃত হিতাকাংখী নন—আর তেমন মাতা তার সন্তানের নিকট হতে ভক্তিশ্রদ্ধা, সেবাযত্ন আশা করলে নিরাশই হবেন।

শুধু মাকে সন্তুষ্ট করে যদি বেহেস্ত অর্জ্জন করা যেতো, তবে বহু চরিত্রহীন কুসন্তানও বেহেস্তের অধিকারী হতে পারে। কারণ সন্তানের পক্ষে মাকে সন্তুষ্ট করা খুবই সহজ। মার জন্যে সন্তান একটু কষ্ট স্বীকার করছে বুঝতে পারলেই মা সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করে থাকেন।

বস্তুতঃ হযরত রসুলে করীম (ছাঃ) তাঁর এই মহাবাণী দ্বারা মা এবং সন্তান উভয়েরই পরস্পরের প্রতি পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের শেষ পরিণতির কথাই বলে দিয়েছেন।

নারী ও পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক গঠন ও শক্তি একরূপ নয়। কিন্তু নারী ও পুরুষের সমন্বয় ব্যতীত মানবতার পূর্ণতা লাভ কখনও সম্ভব নয়। এই সমন্বয় গড়ে উঠবে পরস্পরের সমঝোতার উপর। কিন্তু আজকাল এই সমন্বয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে নারী ও পুরুষের স্থান, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য একই পর্য্যায়ের বলে অনেকে জোর গলায় প্রচার করছেন। অপ্রাকৃতিক ও অবাস্তব বলে এসকল প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে নারী বা পুরুষ যে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত, তাকে সে স্থানই দিতে হবে। ইসলাম তাই করেছে। পরিবারের ভরণ পোষণ ও পরিচালনার বেলায় পুরুষের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছে। দায়ভাগ সাক্ষ্যগ্রহণে দুজন নারীকে একজন পুরুষের সমান ধরেছে। কলেমা, হজ, জাকাত, জ্ঞান অর্জ্জন ইত্যাদির বেলায় নারী-পুরুষে কোন পার্থক্য রাখেনি—আবার বিবাহের শর্তরূপে মোহর-আনা আদায়ে নারীকে পুরুষের উপর বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোন কোন অবস্থায় নারীকে নামাজ হতেও মাফ দেওয়া হয়েছে—আবার প্রয়োজনের তাগিদে তার জন্য পুরুষের চেয়ে অধিকতর পর্দারও ব্যবস্থা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য হবে, যেন নারী ও পুরুষের প্রকৃতিদত্ত গুণরাজি অযথা শুকিয়ে না যায় অথবা অতিবৃদ্ধির দরুণ একে অন্যকে গ্রাস করে না বসে। অনেকে বলে থাকেন যে, নারীদের মধ্য হতে কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি। আমাদের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভিত্তিতে একথা অবশ্য স্বীকার না করে পথ নেই। কিন্তু একথাও সত্য যে, অনেক নবীকে সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করার সম্মান নারীই পেয়েছে। বিশ্বনবীকেও নারীই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। কোরআন করীম মোমেনগণকে বিবি আছিয়া ও মরিয়মের সাথে তুলনা করে নারীদের স্থান

আধ্যাত্মিক জগতে অনেক উচ্চে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া হযরত ঈসা (আঃ) বাপ ছাড়া হয়েছেন বলে নারীজাতি সব নবীরই মাতৃত্বের দাবী করতে পারে—কিন্তু পুরুষ সব নবীর পিতৃত্বের দাবীদার হতে বঞ্চিত।

বস্তুতঃ বিশ্ব প্রকৃতি, কোরআন ও হাদিছ নারীর যে স্থান দিয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে দেশের নারী আন্দোলনগুলির গতি নির্দ্ধারিত হলে অতি সহজেই নারিগণ তাদের লক্ষ্যস্থানে পৌছতে পারবে। 'সিরাতুল মুস্তাকিম' ছেড়ে দিয়ে নিজের মনগড়া আদর্শকে সামনে নিয়ে খোশখেয়ালে নারীদের জন্য "পুরুষের সমান স্থান ও অধিকার" নিয়ে আন্দোলন করলে অযথা শক্তিরই ক্ষয় হবে। অপরদিকে এসকল ভূয়া আন্দোলন নারীজাতিকে আদর্শহীন ও লক্ষ্যচ্যুত করে পরিণামে তাদের অযথা দুঃখ ও দৈন্যেরই কারণ হবে। ইহাতে নারী পুরুষের সহজ সম্পর্কের মধ্যেও অনেক জটিলতা সৃষ্টি হবে।

ইসলাম নারীজাতির জন্য যে স্থান নির্দেশ করেছে, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নারীকে অবশ্যই সে স্থান অধিকার করতে হবে। তজ্জন্য বর্তমান সমাজব্যবস্থাতে অনেক ভাংগাগড়ার প্রয়োজন আছে। তা করতে হলে নারীর যেমন সাধনার প্রয়োজন, পুরুষেরও তার সাথে সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। তজ্জন্য নারী-পুরুষ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

নমায শিক্ষা

[মুমতায আহমদ]

সপ্তম পাঠ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নমাযের বিষয়বস্তু

নমায পাঠকালে নমাযী তাহার সমস্ত মনোযোগ আল্লার সমীপে নিবদ্ধ করিবে এবং একিন রাখিবে যে সে আল্লার দরবারে হাযির হইয়াছে। মনে করিবে যেন সে আল্লাহকে দেখিতেছে। যদি এরূপ ভাব মনে আনিতে না পারে তবে মনে করিবে নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে দেখিতেছে। নমায পড়ার সময় পবিত্র বসন দ্বারা পবিত্র বদনকে ছতর পর্য্যন্ত ঢাকিয়া পবিত্র মনে আল্লাহকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে হাযির নাযির জানিয়া পবিত্র স্থানে কাবা অভিমুখী হইয়া বুকের সংলগ্ন উভয় হাত বাঁধিয়া বিনয় নম্রভাবে দাঁড়াইতে হয়, আল্লার মহিমা বর্ণনা করিতে হয়, শয়তানের পাপ প্রভাব হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য সর্ব্বগুণাকর আল্লার নিকট আশ্রয় মাগিতে হয়, তাঁহার প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহার নামের গুণ গাহিতে হয়, তাঁহার প্রভূত্বের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়, ছালেহ, শহীদ, ছিদ্দিক ও নবীগণের সমমর্য্যাদা সম্পন্ন পদ গৌরবে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে পুণ্যময় সরল পথে চলার জন্য রহমানুর রহীম আল্লার নিকট হেদায়ত প্রার্থনা করিতে হয়, অভিশপ্ত ইহুদী জাতির ন্যায় আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার বন্দাকে খোদার আসনে বসাইবার মত গোমরাহী হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আল্লার সমীপে প্রার্থনা করিতে হয়। ফলকথা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক লৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য খোদার দরগায় প্রার্থনা করার নাম নমায।

নমাযের প্রস্তুতি

নমায পড়ার সময় হইলে প্রথমেই উযু না থাকিলে উযু করিতে হয়। জনাবতের অবস্থা থাকিলে স্নান করিতে হয়। পানী না থাকিলে অথবা পানী ব্যবহার করিতে অসমর্থ হইলে উযু এবং গোছলের পরিবর্ত্তে পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম করিতে হয়। পবিত্র পোষাক পড়িতে হয়। নমাযের স্থান পবিত্র হইতে হইবে। নাভি হইতে হাটু পর্য্যন্ত ঢাকিতে হইবে। কিবলা অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

উযু

প্রথম বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়িতে হয়। তৎপর উভয় হাত কব্জি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ধৌত করিতে হয়। তৎপর তিনবার কুল্লি করিতে হয়, তিনবার নাকের ভিতর পানি প্রবেশ করাইতে হয় এবং বাম হাতের আঙ্গুল ঢুকাইয়া নাক পরিষ্কার করিতে হয়। তৎপর কপালের উপর চুল উঠার স্থান হইতে চিবুক পর্য্যন্ত এবং এক কানের লহর হইতে অন্য কানের লহর পর্য্যন্ত সমগ্র মুখমণ্ডল উভয় হাত দ্বারা ভালমতে তিনবার ধৌত করিতে হয়। তৎপর ডান হাত ইহার পর বাম হাত কনুইসহ তিনবার করিয়া ধুইতে হয়। ইহার পর নূতন পানি লইয়া উভয় হাত দ্বারা মাথা মুছিতে হয়। উভয় হাতের আঙ্গুল মাথার উপর রাখিয়া কপাল হইতে পশ্চাৎ দিকে মাথার খুলির নীচ পর্য্যন্ত টানিয়া নিতে হয় এবং উভয় হাতের পাতা মাথার উভয় পার্শ্ব দিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে সামনের দিকে টানিয়া আনিতে হয়। উভয় হাতের শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা উভয় কানের ভিতর দিক এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের বাহির দিক মুছিতে হয়। অতঃপর প্রথম ডান পা তৎপর বাম পা গুলফ সহ ভাল করিয়া ধুইতে হয় এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলের ভিতর বাম হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া খেলাল করিতে হয়। উযু করিতে এমন ভাবে তৎপরতার সহিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ধুইতে হয় যেন একটা শুকাইবার আগে অন্যটা ধৌত করা হয়।

গোছল

প্রথম শরীরের যে যে স্থানে নজাছত থাকে তাহা ধুইতে হয়। তৎপর উযু করিতে হয়। ইহার পর সমস্ত শরীরে জল প্রবাহিত করিয়া উত্তমভাবে মাজিয়া ঘষিয়া ধৌত করিতে হয়। কুল্লি করা, গরগরা করা, নাকের ভিতর পানি প্রবেশ করান, কানের ভিতর ভিজা আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া ভালমতে ভিজাইয়া লওয়া, নাভির ভিতর আঙ্গুলি দ্বারা ধৌত করা, কানে, নাকে অলঙ্কারের ছিদ্রে অলঙ্কারগুলি হিলাইয়া দুলাইয়া তাহাতে পানি প্রবেশ করান এবং উভয় বগল ভালমতে ধৌত করা অত্যন্ত আবশ্যক।

তৈয়ম্মুম

পানী না পাইলে অথবা রোগের দরুণ বা অন্য কোন কারণে পানি ব্যবহার করিতে অপারগ হইলে উযু এবং গোছলের পরিবর্ত্তে তৈয়ম্মুম করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম কোন উযরে এবং কোন কাজের জন্য তৈয়ম্মুম করা যাইতেছে তাহার ভাব মনে আনিতে হয় তৎপর পবিত্র মাটীর উপর অথবা ধূলা জড়িত কোন পবিত্র বস্তুর উপর উভয় হাত দ্বারা থাবা মারিতে হয় তৎপর উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছিতে হয় তৎপর উভয় হাত কব্জি পর্য্যন্ত অথবা কনুই পর্য্যন্ত মুছিতে হয়। একবার হাত দ্বারা থাবা মারা যথেষ্ট। দুইবার হাত মারিলেও কোন দোষ নাই।

উযু, গোছল ও তৈয়ম্মুমের পর এই দোয়া পড়া হয়

আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রছুলুহু আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবীনা ওজআলনী মিনাল মুতা-তাহিহরীন—অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেহ নাই তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লার গোলাম ও তাঁহার পয়গম্বর। হে আল্লাহ তুমি আমাকে তওবাকারিগণের দলভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জ্জনকারিগণের মধ্যে পরিগণিত কর।

ওয়াহদাহু—তিনি এক। লা-শরীকালাহু—তাঁহার কোন শরীক নাই। ইজআলনী—আমাকে কর। মিনাত তাওয়াবীনা—তওবাকারিগণের দলের মিনাল মুতাতাহিহরীনা—পবিত্রতা অর্জ্জনকারিগণের দলের।

যে যে কারণে উযু ও তৈয়ম্মুম ভঙ্গ হয়

পেশাব করিলে, পাখানা করিলে, মলদ্বার দিয়া বায়ু বা কৃমি বাহির হইলে মূত্রদ্বার দিয়া মনি বা মজি নির্গত হইলে, শোয়া অবস্থায় নিদ্রা গেলে, বসা অবস্থায় বা দাঁড়ান অবস্থায় কোন বস্তু ঠেস দিয়া নিদ্রা গেলে, নমাযে অট্টহাসি হাসিলে, রক্ত বা পুঁজ নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইলে, যে কারণে তৈয়ম্মুম করা গিয়াছিল তাহা দূর হইলে।

আযান

মুয়াযযিন কাবা অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া উভয়কানে শাহদত অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া উচ্চস্বরে থামিয়া থামিয়া নিম্নলিখিত শব্দগুলি বলিবে "আল্লাহু আকবর" চারিবার, "আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" দুইবার, "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রছুলুল্লাহ" দুইবার, "হাইয়্যা আলাছছালাত" দুইবার, "হাইয়্যা আলাল ফালাহ" দুইবার, "আল্লাহু আকবর" দুইবার, লা-ইলাহাইল্লাল্লাহ একবার।

ফযরের আযানে হাইয়্যা আলালফালা বলার পর "আছছালাতু খয়রুম মিনান্নাওম" (নমায নিদ্রা হইতে উত্তম) দুইবার বলিতে হয়।

আযানের পরের দোয়া

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদিন ও আলা আলি মুহাম্মাদিন ও বারিক ও ছল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ; আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত-তাম্মাতি ওছছালাতিল কায়েমাতে, আতি ছয়িয়দানা মুহাম্মাদানিল অছিলাতা অল-ফযীলাতা অদদারাজাতার রফীয়াতা ওয়াব আছহু মকামাম্মাহমুদা নাল্লাযি ওয়াআদতাহু; ইন্নাকা লাতুখলিফুল মীআদ"—হে আল্লাহ তুমি পূর্ণ অনুগ্রহ নাযিল কর হযরত মহম্মদের উপর ও মুহাম্মদের উম্মতের উপর এবং বরকত নাযিল কর ও শান্তি নাযিল কর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয়, গৌরবময়। হে আল্লাহ, হে এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নমাযের প্রভু, তুমি আমাদের ছরদার হযরত মুহাম্মদ (দঃ)কে নৈকট্য, গৌরব ও উচ্চ মর্য্যাদা দান কর এবং তুমি যে মকামে মাহমুদের ওয়াদা করিয়াছ সেই মকামে তাঁহাকে উন্নীত কর, নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না।

মছজিদে প্রবেশকালীন দোয়া

বিছমিল্লাহিছ ছালাতু ওছছালামু আলা রছুলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রহমতিকা—আমি আল্লার নাম লইয়া প্রবেশ করিতেছি; পূর্ণ অনুগ্রহ ও শান্তি নাযিল হউক আল্লার প্রেরিত নবীর উপর। হে আল্লাহ, তুমি আমার পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বারগুলি খুলিয়া দাও।

মসজিদ হইতে বাহির হওয়াকালীন দোয়া মসজিদে প্রবেশকালীন দোয়ার মত। শুধু শেষ শব্দ 'রহমতিকা' স্থলে 'ফযলিকা' বলিতে হয়। ইহার অর্থ আমার জন্য তোমার রিযেকের দ্বারগুলি খুলিয়া দাও।

একামত

ফরয নমায আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইমামের আদেশে মুয়াযযিন অথবা অন্য ব্যক্তি কাবার দিকে মুখ করিয়া কানের উপর হাত না রাখিয়া আযানের শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে উচ্চারন করিবে। তবে আল্লাহু আকবর দুইবার এবং অন্যান্য শব্দগুলি একএকবার বলিবে এবং হায়্যা আলালফলাহ বলার পর "কাদ কামাতিছছালাতু" দুইবার বলিবে অর্থাৎ নমায আরম্ভ হইয়াছে।

নমায পড়ার নিয়ম

প্রথম নমাযের জন্য কাবা অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইতে হয়। ইহাকে কিয়াম বলে। কোন অক্তের নমায, কত রাকাত নমায এবং কিরূপ নমায এইভাব মনের মধ্যে হাযির করিয়া উভয় হাত কান পর্য্যন্ত অথবা কাঁধ পর্য্যন্ত উঠাইয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া উভয় হাত বুকের সংলগ্ন বাঁধিতে হয়। ডান হাত উপরে ও বাম হাত নীচে থাকিবে। হাতের উপরে হাত কব্জির উপরে কব্জি থাকিবে। ডান হাতের মধ্যের তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপরে থাকিবে এবং বুড়া আঙ্গুল ও কানি আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতকে বেষ্টন করিয়া ধরিবে। তৎপর ছানা, তাআউয ও তছমিয়া পড়িয়া ছুরা ফাতিহা পড়িবে। ফাতিহা শেষ করিয়া আস্তে বা নিম্নস্বরে আমীন বলিবে। তৎপর তছমিয়া পড়িয়া অন্য কোন ছুরা বা কমপক্ষে কুরআনের ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত পড়িবে। তৎপর আল্লাহু আকবর বলিতে থাকিয়া রুকু করিবে। রুকু করিতে উভয় হাত দ্বারা উভয় হাটুকে শক্ত করিয়া ধরিবে। কোমর, মাথা এবং পিঠ সমান থাকিবে। রুকুতে তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার তছবীল পড়িবে। তৎপর তছমী বলিতে থাকিয়া মাথা সোজা করিয়া দাঁড়াইবে। দাঁড়াইয়া তহমীদ বলিবে, তৎপর আল্লাহু আকবর বলিতে থাকিয়া ছেজদা করিবে। ছেজদায় উভয় পায়ের অগ্রভাগ, উভয় হাটু উভয় হাতের পাতা এবং নাক ও কপাল মাটিতে রাখিবে। উভয় হাতের পাতা নাকের বরাবরে থাকিবে। পেট উরু হইতে পার্শ্ব বাহু হইতে ও হাত মাটি হইতে পৃথক থাকিবে। ছেজদায় তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার তছবীহ পড়িবে। তৎপর আল্লাহু আকবর বলিতে থাকিয়া সোজা হইয়া বসিবে। বসিবার সময় বাম পায়ের পাতা বিছাইবে এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া থাকিবে বসিয়া দোয়া করিবে। তৎপর আল্লাহু আকবর বলিতে থাকিয়া দ্বিতীয় ছিজদা করিবে। ছেজদায় আগের মত তছবীহ পড়িবে। তৎপর আল্লাহু আকবর বলিতে থাকিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। এখন এক রাকাত পূর্ণ হইল এবং দ্বিতীয় রাকাত আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের মত পড়িবে শুধু ছানা ও তাআউয পড়িবে না। যদি নমায দুই রাকাত হয় তবে দ্বিতীয় রাকাতের শেষ ছেজদার পর দাঁড়াইবে না, মাথা তুলিয়া বসিবে। তৎপর তশহ্হুদ, দরূদ ও দোয়া পড়িবে। তৎপর ছালাম ফিরাইবে। যদি নমায তিন রাকাতের হয় তবে দুইরাকাত পড়ার পর বসিয়া শুধু তশহ্হুদ পড়িবে। তৎপর আল্লাহু আকবর বলিতে থাকিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে এবং পূর্ব্বের মত আর এক রাকাত পড়িবে। যদি নমায চার রাকাতী হয় তবে তশহ্হুদের পর দুই রাকাত পড়িবে। যদি নমায ফরয হয় তবে শেষ দুই রাকাতে শুধু ফাতিহা পড়িবে এবং রাকাত-গুলি শেষ করিয়া বসিয়া তশহ্হুদ, দরূদ ও দোয়া পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে।

[ক্রমশঃ]

মোবারক জমানা

[আবুল আছেম খান চৌধুরী]

মোবারক মোবারক মাহদীর জমানা।
চল ছুটে নওজোয়ান কারু কথা শুন না ॥
মাহমুদের (আইঃ) হাতে আজ ইসলামের ঝাণ্ডা।
নাস্তিকতা চিরতরে হবে এবার ঠাণ্ড ॥
জড়বাদীর কোলাহল উগারিছে হলাহল।
শয়তান রূপধরে আজরাইল চঞ্চল।
ভয় নাই ভয় নাই—চল ছুটে নওজোয়ান।
ইতিহাস বদলে যাক, মোসলেমের সন্তান ॥
শোনিতের ধারা দিয়ে লিখে দাও ইতিহাস।
পিছে যেন এসে কেহ, নাহি করে পরিহাস ॥
ডাকিতেছে খলিফা (আই) নওজোয়ান ছুটে আয়।
"জান্নাতের" দ্বারগুলি, ঐ ঝ বন্ধ হয়?
নহে সেথা হবে স্থান—যাবে শুধু নওজোয়ান।
নির্জীব কুঁড়ে যারা, হোক সব পেরেসান ॥
মোবারক খলিফা মোবারক মাহদী।
পাকিস্তানী নওজোয়ান, চল ছুটে জলদী ॥
দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি হয় করি স্তন্য পান।
তৌহিদ পীযুষে বাড়ে রুহানী ইমান ॥

পুস্তকাদির সাহায্যে তবলীগ

[এম, আজমল শাহেদ]

আল্লাহতায়ালা হযরত মছীহে মওউদ (আঃ)কে ছুলতানুল কলম উপাধি দান করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা তাঁহার লেখনীতে এমন শক্তি দিয়াছিলেন যে তাঁহার লিখিত বিষয় পাঠে লোক বিমোহিত হইয়া যায় এবং তাঁহার হৃদয়ে এমন রেখা পাত হয় যে সে ইহাতে অভিভূত না হইয়া পারে না। আল্লাহতালা তাঁহাকে উন্নত প্রণালীর নূতন ন্যায় শাস্ত্রের জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে একদিকে যেমন ইছলামের অনুগামীদের জন্য স্বর্গীয় আলো রহিয়াছে অন্যদিকে তেমনি ইছলামের শত্রুগণের বিরুদ্ধে ইছলামের সংরক্ষণ ও প্রচারের উপযোগী অকাট্য যুক্তি ও উজ্জ্বল প্রমাণ সমূহ বিদ্যমান আছে। তাঁহার এই জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে তাঁহার খলিফা ও অনুগামীগণ প্রচুর জ্ঞান আহরণ করতঃ বহুবিধ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এইগুলি উর্দ্দু ভাষায় বিধায় সাধারণভাবে বাঙ্গালী ভাইগণ ইহা হইতে যথোপযুক্ত উপকার লাভ করিতে পারেন নাই।

এইগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। যে সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী উর্দ্দু ইংরেজীতে জ্ঞান রাখেন তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন হযরত মছীহে মওউদ (আঃ)এর লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করতঃ স্বর্গীয় জ্ঞানের আলোকে হৃদয় আলোকি করেন।

তিনি তাঁহার পুস্তকগুলি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করার জন্য "নুযুলুল মছীহ" নামক কিতাবের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষের বাণী মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে না এবং তাঁহার লিখিত কিতাবগুলি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করে না, নিশ্চয় তাহার মধ্যে অহঙ্কার রহিয়াছে। অতএব তোমরা যত্ন সহকারে সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার পরিহার কর, তাহা হইলে তোমরা পরিজনসহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।"

হযরত খলিফাতুল মছীহ ছানী হযরত মছীহে মওউদ (আঃ)এর কিতাবগুলি পাঠ করার জন্য বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন "যে মহাপুরুষের উপর ফেরেস্তা নাযিল হইতেন তাঁহার লিখিত কিতাব পাঠ করিলেও ফেরেস্তা অবতীর্ণ হন। এই জন্যই তাঁহার লিখিত কিতাব পাঠকালে নানাবিধ জ্ঞান ও তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। হযরত মছীহে মওউদ (আঃ)এর কিতাবে আধ্যাত্মিকতা প্রবাহমান রহিয়াছে। ঐগুলি পাঠ করিলে ফেরেস্তা হইতে আধ্যাত্মিকতা লাভ করা যায় এবং বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞান উদ্ঘাটিত হয়।

আহমদীগণের পক্ষে উহা পাঠ করা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য সেইরূপ অন্যকে উহা পাঠ করিতে দেওয়াও একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যুগে প্রতিপক্ষের সামনে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে ইছলামের সততা ও সার্ব্বজনীনতা প্রকাশ ও প্রতিভা করাই জেহাদ। গয়র আহমদীকে আহমদীয়া পুস্তক পড়িতে দেওয়া একটা উত্তম ও নীরব তবলীগ। এই কাজে অবহেলা করিলে নিশ্চয় আমরা দায়ী হইব।

যদি প্রকৃত পক্ষে ইছলাম প্রচারের পূর্ণতা সাধনই আমাদের কর্ত্তব হইয়া থাকে, তবে যে সমস্ত পুস্তকাদি তত্ত্বজ্ঞানের মণিমুক্তায় ও সূক্ষ্ম গবেষণায় পরিপূর্ণ তাহা যথাশীঘ্র অনুসন্ধিৎসুগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা আবশ্যক। এই কিতাবগুলি সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করার উপযোগী যাহারা বর্ত্তমান যুগে ভ্রান্ত ন্যায় শাস্ত্র ও মারাত্মক দুর্নীতির কবলে নিপতিত এবং অধার্ম্মিকতার বিষে জর্জ্জরিত। এই পুস্তকগুলি এমনভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়া দরকার যেন প্রত্যেক সত্যের অনুরাগী ব্যক্তির হাতে ইহা পৌছিয়া যায়।

হযরত মছীহে মওউদ (আঃ)এর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে জড়বাদিতায় আড়ষ্ট দেশ সমূহে তাঁহার কিতাবগুলি বিপুলভাবে প্রচারিত হউক; ঐগুলির জ্ঞান সুধা পান করিয়া মৃত জাতিগুলি আবার জীবন্ত হইয়া উঠুক।

অতএব আহমদী ভাইগণের নিকট আমার একান্ত নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন ছিলছিলার কিতাবগুলি খরিদ করিয়া নিজে পাঠ করেন এবং অন্যকেও পাঠ করিতে দেন। নিম্নে কতকগুলি উর্দ্দু, ইংরেজী ও বাংলা কিতাবের নাম দেওয়া গেল। ইহা ছাড়াও অন্যান্য কিতাব সরবরাহ করা যাইতে পারে।

মছীহ হিন্দুস্তান মে	১৵০	ইন্ট্রডাকসন টু দি কুরআন	৬॥০
নুযুলুল মছীহ	২৸০	আহমদীয়ত অর ট্রু ইছলাম	
হকীকতুল ওয়াহী	৬।৵০	এমেরিকান এডিসন	৮৲
চশমায়ে মারিফত	৪।০	দি টিচিঙ্গস্ অব ইছলাম	১॥৵০
কিস্তীয়ে নূহ	॥৴০	নিউ ওয়ার্লড অরডার	॥৵০
বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম খণ্ড	৩৲	যিযাস্ ক্রাইষ্ট	॥৵০
আইনায়ে কামালাতে ইছলাম	৬॥০	ইছলাম এণ্ড ইটস্ কম্পারিজন	
আরবাঈন	১॥৵০	উইথ আদার রিলিজিয়নস্	২৲
তফছিরে কবীর ১ম খণ্ড	৭৲	খাতামুন্নবিয়ীন (বাংলা)	১॥০
ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড	৭৲	ইছলামেই নবুওত	॥০
তফছীরে ছুরা কাহাফ	১॥৵০	ফতেহ ইছলাম	।০
ইছলাম আওর মিলকিয়তে জমীন	২॥৵০	আহমদীয়তের পয়গাম	।৵০
দাওয়াতুল আমীর	৪।৵০	জরুলতুল ইমাম	।৵০
ইছলামমে এখতেলাফাতকা আগায	১৵০	একটি ভুল সংশোধন	।০
কুরআনের ইংরেজী ব্যাখ্যা ১ম খণ্ড	২৬৲;		
ঐ ২য় খণ্ড	১৪৲		

——

হযরত মছীহ (আঃ)এর কিতাব

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

দাসগণ, কেবল 'ইস্মী' ও 'রস্মী' ইসলামে (নামের ও রীতির ইসলামে) সন্তুষ্ট থাকিও না। আঞ্জোমন ও মাদ্রাসা সমূহের সাহায্যে যে সকল তদবীর করা হইতেছে, মনে করিও না যে প্রকৃত মঙ্গল ও কল্যাণ এবং শেষ কৃতকার্য্যতা উহার মধ্যেই নিহিত আছে। গোড়া পত্তন হিসাবে এই সকল প্রতিষ্ঠান হিতকর বটে এবং এগুলি উন্নতির প্রথম সোপান বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের মূল উদ্দেশ্য হইতে এগুলি বহু দূরে। এই সকল তদবীরে মস্তিষ্কের প্রখরতা লাভ হইতে পারে; কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং শুষ্ক তর্কের ক্ষমতা হয়তো লাভ হইতে পারে, আলেম-ফাজেল বা বিদ্যাবিশারদ উপাধি অর্জ্জন হইতে পারে, দীর্ঘকাল বিদ্যাশিক্ষার পর মূল উদ্দেশ্যের কতকটা সাহায্যও হইতে পারে, কিন্তু "তা তিরিয়াক আজ এরাক আওর্দা শাওয়াদ, মারগজিদাহ মুর্দা শওয়াদ" —ইরাক হইতে বিষের প্রতিকার আসিতে আসিতে সাপেকাটা ব্যক্তি মরিয়া যাইবে।

অতএব জাগ্রত এবং সাবধান হও, যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া না যাও—শেষ পরিণতি যেন নাস্তিকতা এবং বিশ্বাসহীনতা না হয়। নিশ্চয় জানিও, এই সকল 'রছমী' বিদ্যা অর্জ্জনের উপর কখনো কৃতকার্য্যতা পূর্ণরূপে নির্ভরশীল বা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। পরিণামে কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য স্বর্গীয় জ্যোতির প্রয়োজন। ইহা সকল সন্দেহ দূরীভূত করে, কুপ্রবৃত্তির ও দুরাকাঙ্খার অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে এবং খোদাতা'লার প্রতি খাঁটি ভালবাসা, খাঁটি প্রেম ও খাঁটি আনুগত্য সৃষ্টি করে। তোমাদের নিজ নিজ বিবেককে জিজ্ঞাসা কর, উত্তর পাইবে যে সত্যিকারের মনের প্রবোধ ও শান্তি এখনও তোমরা পাও নাই, যাহা মুহূর্ত্তে

আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। একান্তই দুঃখের বিষয়, প্রচলিত আচার, অনুষ্ঠান ও শিক্ষা প্রচারের জন্য তোমরা যেরূপ আবেগ রাখ, তাহার দশমাংশও স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য রাখ না। তোমাদের জীবন যে সকল কার্য্যে উৎসর্গ হইতেছে, ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন প্রকার সংস্রব নাই; থাকিলেও তাহা অতি নগণ্য এবং জীবনের মূল উদ্দেশ্য হইতে তাহা বহু দূরে। তোমাদের মধ্যে যদি সেই অনুভূতি ও সেই জ্ঞান থাকে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াই যাহা ক্ষান্ত হয়, তবে সেই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনো বিশ্রাম করিও না।

হে লোকগণ! তোমরা সৃষ্ট হইয়াছ তোমাদের প্রকৃত খোদা, প্রকৃত স্রষ্টা ও প্রকৃত উপাস্যের পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম ও আনুগত্য দেখাইবার জন্য। তোমাদের সৃষ্টির এই মূল উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তোমাদের জীবনে প্রকটিত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা 'নাজাত' বা মুক্তি হইতে বহু দূরে থাকিবে। যদি ইন্‌ছাফের সহিত কথা বল, তোমরাই তোমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সাক্ষী হইতে পার। খোদার উপাসনার পরিবর্ত্তে দুনিয়া-পূজার এক মহাকায় পুতুল সর্ব্বদা তোমাদের চক্ষের সামনে রহিয়াছে। প্রতি সেকেণ্ড তোমরা তাহাকে হাজার বার সেজদা করিতেছ। দুনিয়ার কার্য্যে ও বৃথা আলাপে তোমাদের সমুদয় সময় নিঃশেষ হইতেছে; অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তোমাদের নাই। এই জীবনের পরিণাম কখনো স্মরণ করিয়াছ কি? তোমাদের মধ্যে 'ইন্‌ছাফ' কোথায়? 'আমানত' কোথায়? সেই সাধুতা, খোদা-ভীতি, সততা ও বিনয় কোথায়, যাহার দিকে কোরান তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে? ভুলেও তো কননো তোমাদের স্মরণ হয় না যে খোদা আছেন এবং তাঁহার প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য কি। সত্য কথা এই যে, সেই চিরঞ্জীব খোদার সহিত তোমরা কোন সম্পর্ক রাখ নাই। তাঁহার নাম স্মরণ করাও তোমাদের নিকট কঠিন বোধ হয়। অবশ্য চালাকি করিয়া ইহা অস্বীকার করিবে এবং বলিবে যে, না কখনো এরূপ নয়। কিন্তু খোদাতা'লার সুনির্দ্দিষ্ট বিধান তোমাদিগকে লজ্জিত করিতেছে। উহা জানাইয়া দিতেছে যে তোমাদের মধ্যে 'ইমানদারীর' কোন লক্ষণ নাই। পার্থিব চিন্তায় ও গবেষণায় তোমরা বুদ্ধিমত্তা এবং মতের দৃঢ়তার বড় বড় দাবী কর। তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতা দুনিয়ার সীমা পর্য্যন্তই নিঃশেষ হইয়া যায়। তোমাদের এই বুদ্ধি দ্বারা পরজগতের এক কোণাও তোমরা দেখিতে পারিবে না, যেখানে চিরকাল বাস করিবার জন্য তোমাদের আত্মাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই পার্থিব জীবনে তোমরা তেমনই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া আছ, যেমন সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব কোন চিরস্থায়ী বস্তু পাইলে। পরজগতের আনন্দই প্রকৃত শান্তি ও সন্তোষের কারণ। উহা চিরস্থায়ী। সারা জীবনে একবারও তোমাদের ইহা স্মরণ হয় না' কি দুর্ভাগ্য! এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তোমরা একেবারেই উদাসীন এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিয়া আছ, অথচ নগণ্য ক্ষণস্থায়ী বস্তুর আকাঙ্খায় দিবারাত্র দ্রুত ধাবিত হইতেছ। তোমরা খুব জ্ঞাত আছ যে নিশ্চয়ই তোমাদের উপর একটা মুহূর্ত্তে আসিবে যখন তোমাদের জীবন ও সমস্ত আকাঙ্খার অবসান ঘটিবে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কথা জানিয়াও তোমরা নিজেদের সমস্ত সময় দুনিয়ার অনুসন্ধানেই বরবাদ করিতেছ। তোমাদের দুনিয়ার অনুসন্ধানও বৈধ উপায়েই সীমাবদ্ধ নহে। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যায়ভাবে খুন করা পর্য্যন্ত যাবতীয় অবৈধ উপায়কেও তোমরা বৈধ করিয়া রাখিয়াছ। তোমাদের মধ্যে এই সমস্ত লজ্জাকর পাপ থাকা সত্বেও তোমরা বল যে স্বর্গীয় জ্যোতি ও স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের তোমাদের আবশ্যক নাই। তোমরা ইহার প্রতি কঠোর শত্রুতা পোষণ কর। খোদাতা'লার স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানকে তোমরা বড়ই হেয় মনে কর। উহার নাম উল্লেখ করিতেও তোমাদের জিহ্বা ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করে। অহঙ্কারের সহিত নাসিকা কঞ্চিত করিয়া তোমরা তোমাদের বিদ্রূপের কর্ত্তব্য সমাধা কর। তোমরা বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা কর, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে ইহা আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সিলসিলা? এখনই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিয়াছি। বৃক্ষকে উহার ফল দ্বারা চিনিবে; সূর্য্যকে উহার জ্যোতি দ্বারা চিনিবে।

আমি 'পয়গাম' পৌছাইয়া দিয়াছি; কবুল করা না করা এবং স্মরণ রাখা না রাখা তোমাদের ইচ্ছাধীন।

জিতেজি কদর বসর কি নেহি হ'তি পিয়ারো
ইয়াদ আয়েঙ্গে তোমহে মেরে ছোখন মেরে বাদ

—জীবিত অবস্থায় মানুষের কদর হয় না হে প্রিয়গণ, আমার কথা তোমাদের স্মরণ হইবে আমার মৃত্যুর পরে।

আহমদী

[আবুল হুসেন]

মৃত্যু ভয়ে ভীত নহে আমার হৃদয়,
যুগধর্ম্ম ধর্ম্ম মোর, আমি হিমালয়।
যা কিছু আমার আছে, এ ধরণী তলে,
শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে তা' দিব সকলে
তবু কোন মূঢ় যদি হিংসা দ্বেষ বশে
হানে জোরে অস্ত্রশস্ত্র মোর বক্ষ দেশে,
প্রত্যার্পিত আঘাতে সে পাবে প্রতিফল
যেরূপ পেয়েছে আগে ফেরাউন দল।

দারোত তবলীগ ফণ্ডের ওয়াদা
(২য় দফা)

১।	ডাক্তার আবদুল মজিদ	১০০৲	
২।	আজিজুন্নেছা বেগম	৫৲	আদায়
৩।	আলী কাছেম খান চৌধুরী	১০৲	
৪।	মিসেস্ আমাতুর রহমান	১০৲	
৫।	মরহুম আবুল হাশেম খান চৌধুরী		
৬।	মরহুম হামিদাতুন্নেছা (আলী কাশেম সাহেবের মাতাপিতা)	১০৲	
৭।	মরহুম মৌলবী আবদুর রহিম		
৮।	মরহুম মিসেস আবদুর রহিম আলী কাশেম সাহেবের শশুর শাশুরী	১০৲	
৯।	বসির উদ্দিন আমজাদ আহমদ		
১০।	বসির উদ্দিন আনুয়ার আহমদ		
১১।	বসির উদ্দিন আকরম আহমদ	১০৲	
১২।	বসির উদ্দিন আফজল আহমদ		

নারায়ণগঞ্জের ওয়াদা

১।	আনোয়ার আহমদ কাহলুন	....	....		১০০৲
২।	ডাক্তার আবদুছ ছামাদ খান চৌধুরী	....	....		২০৲
৩।	মুন্সি আবদুল খালেক	....	....	....	৫৲
৪।	মুন্সি বদর উদ্দীন	....	....	....	৫৲
৫।	আহসান উল্লা সিকদার	....	....	....	৫৲
৬।	আনছার আলী	....	....	....	৫৲
৭।	কেরামত আলী	....	....	....	৫৲
৮।	আবদুছ ছোবহান	....	....	....	৫৲
৯।	মৃত আবদুল আবদুল হাফিজ (ভাতগড়)				১০৲ আদায়

(ক্রমশঃ)

এক লোকমা

মোহম্মদ মোস্তাফা আলী

["কৃষি-কথা" কার্তিক, '৬০ হইতে উদ্ধৃত]

—'খেতে বসে আবার চুপচাপ বসে আছ যে? লোকমা হাতে নিয়ে কি ভাবছ, কার কথা ভাবছ?' বিরক্তি মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বিবি জান।

—'কারও কথা ভাবছিনে, লোকমা হাতে নিয়ে লোকমার কথাই ভাবছি।'

'—রান্না বুঝি ভাল হয় নি?'

'আরে না। তাহলে আর ভাববার কি ছিল; তোমাকে দু'কথা শুনালেই হয়ে যেতো।'

—'খেতে অরুচি না হলে লোকমা হাতে নিয়ে এতক্ষণ অযথা বসে আছ কেন?

—'লোকমার ভিতর দিয়ে তোমার কথাও ভাবছি।'

—'আমার কথা এমনি কত ভাবো, আবার আমাকে লোকমার ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?'

—'আরে শুন, এইত দেখছ ছোট্ট একটি লোকমা; কিন্তু এর ইতিহাস কত বড় ও ব্যাপক তা ভেবে দেখেছ কি?'

—'সারাদিন বিজ্ঞান দর্শন কত কি বলে বলে সময় কাটাও—তাতেও হয় না, আবার লোকমার ইতিহাস নিয়ে খাওয়া বন্ধ করে বসে আছ। গরম ভাত ঠাণ্ডা করলেই বুঝি ইতিহাস হয়?'

—'শুন, তুমি রান্না করে রুচিসম্মত করে সামনে এনে দিয়েছ বলে মনে করো না এখন যা খাচ্ছি তা তোমারই শ্রমের ফল। ভেবে দেখ, এই যে এক লোকমা ভাত মুখে দিতে যাচ্ছি এতে কত অজানা-অচেনা লোকের শ্রম রয়েছে, মহব্বত লুক্কায়িত আছে। কোন্ অজানা-অচেনা চাষী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিতে ধান বুনেছিল? তারপর কত যত্ন করে সে ফসলের হেফাজত করেছে; রোগ বালাই, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর হাত হতে রক্ষা করেছে। তারপর ফসল ঘরে তুলেও তাকে চোর-ডাকাতের হাত হতে রক্ষা করার জন্য কতো অশান্তি পোহাতে হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়! কেহ এই ধান সিদ্ধ করেছে, কেহ তা শুকিয়ে নিয়ে ঢেকির সাহায্যে চাউল করে দিয়েছে। তাতেও তুমি-আমি সহরে বসে ভাত পেতুম কি? কত ব্যবসায়ীর হাত বদল করে, কত রেশনের দোকান পাড়ি দিয়ে চাউল আমাদের ঘরে এসেছে। তাতেও ভাত হয়নি। তোমার কোমল হাত শক্ত খড়ি এবং আগুন-পানির সংযোগে এসে ঐ চাউল ভাত হয়ে আমার পাতে এসেছে। তা' ছাড়া প্রকৃতি পদে পদে কতভাবে আলো বাতাস, রোদ বৃষ্টি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছে। দূর দূরান্তের কত গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব এতে রয়েছে তার হিসাব কে করবে?

তেমনি করে ভেবে দেখো তরকারীর কথা!

* * * *

তাই লোকমা নিয়ে ভাবছি, শুধু তোমার শুকরিয়া আদায় করলেই খোদা-তা'লা সন্তুষ্ট হবেন কি? যে কৃষক-কৃষাণী ধান বুনেছিল, যে তা সিদ্ধ করে শুকিয়ে নিয়ে চাউল করেছিল, যারা নানা আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথ বেয়ে তা আমাদের দরজায় বহন করে নিয়ে আসল তাদের সকলের জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত নয় কি? তাদের আমরা দেখিনি, তারাও আমাদের দেখেনি; কিন্তু এই লোকমার ভিতর দিয়ে তাদের মহব্বতকে ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাই ভাবছি, তাদের মেহনতের ফল যদি শুধু উজাড় করে যাই আর তাদের জন্য কিছুই না করি তবে ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি আওড়াইলেই কি ঋণ শোধ হবে?*

*দিল্লীর মরহুম হজরত পীর মাজহার জান জানান সাহেবের লাড্ডু খাওয়ার গল্প অবলম্বনে লিখিত!

পাঞ্জাব হাঙ্গামার তদন্ত আদালতে
খওয়াজা নাজিমুদ্দীনের সাক্ষ্য

লাহোর, ৩০শে নবেম্বর।—অদ্য পাঞ্জাব হাঙ্গামার তদন্ত আদালতে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দীন তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, আইন ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে না হইয়া কেবলমাত্র দাবীর ভিত্তিতেই কাদিয়ানী-বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হইলে পরিস্থিতি অবশ্যই দশগুণ জটিল আকার ধারণ করিতে এবং সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনয়ন করা হয়তো সরকারের পক্ষে সম্ভব হইত না। তিনি বলেন যে, পরিস্থিতি আয়ত্তে আনয়নের জন্য মিয়া মমতাজ দওলতানা ৬ই মার্চ্চ তারিখে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, সীমান্ত প্রদেশের বেলায় খান আবদুল কাইয়ুম খানও তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন যে, তিনি যতদূর জানেন, তাহাতে মিয়া দওলতানা বলিয়াছিলেন: "কাদিয়ানীগণকে সংখ্যালঘু ঘোষণার যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা আমি সমর্থন করি। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় এই দাবী দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবার পর আমি নিজে আপনাদের (আন্দোলনকারীদের) পক্ষ হইতে এই দাবী লইয়া সংগ্রাম করিব।"

খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন যে, সীমান্ত ও উপজাতীয় এলাকার জনসাধারণ কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে তেমন অংশ গ্রহণ করেন নাই। কারণ, তাঁহারা শুধু দাবীর ভিত্তিতে এই আন্দোলন চালাইয়া যাইবার পক্ষপাতী নহেন বলিয়াই তিনি মনে করেন।

খওয়াজা নাজিমুদ্দীন এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন শুধুমাত্র দাবীভিত্তিক হইলে সীমান্ত প্রদেশ, আফগানিস্তান, পাঞ্জাব এমন কি বাহওয়ালপুরও শেষ পর্য্যন্ত এই আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়িত।

পাঞ্জাব হাঙ্গামার তদন্ত আদালতে খওয়াজা নাজিমুদ্দীন অদ্য সহ দুইবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজীর হন। এ পর্য্যন্ত জামাতে এছলামী, মজলিসে আমল এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবোয়ার পক্ষ হইতে তাঁহাকে জেরা করা হয়। বর্ত্তমানে মিয়া দওলতানার পক্ষের কৌঁসুলী তাঁহাকে জেরা করিতেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে খওয়াজা নাজিমুদ্দীনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছে। তাঁহার সাক্ষে রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সংক্রান্ত যে সকল বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, আদালত সেগুলির প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া নিয়াছেন।

খওয়াজা নাজিমুদ্দীন তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন: যাহারা কাদিয়ানী বিরোধী দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিবার পরামর্শ দিতেছিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে আমি কোন কিছু বলিতে চাই না। তবে বিষয়টি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপাইবার পক্ষপাতী এমন নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ আমাকে করিতেই হইবে।"

তিনি বলেন, 'পুলিশ অথবা সামরিক বাহিনী গুলীবর্ষণ করিলে প্রাদেশিক নেতৃবর্গ স্বভাবতঃই বলিতেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশেই এমন হইয়াছে। আবার ঘটনাচক্রে কেন্দ্রীয় সরকার বানচাল হইয়া গেলে তাঁহারা জনসাধারণকে

অবশ্যই একথা বলিতেন, 'আমরা আগা গোড়া আপনাদিগকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছি।

কাদিয়ানী বিরোধী দাবী দাওয়া মানিয়া লওয়া হইলে উহার ফলাফল কি দাঁড়াইত, সে সম্পর্কে আদালতের এক প্রশ্নের জওয়াবে খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন যে, এই সকল দাবী দাওয়া মানিয়া লওয়ার ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ণয় করা খুবই শক্ত ব্যাপার।

তিনি বলেন যে, কাদিয়ানী বিরোধী দাবীদাওয়া একান্তভাবেই পাকিস্তান গণপরিষদের আওতাভুক্ত। কাজেই সরকারের পক্ষে এ সম্পর্কে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন যে কাদিয়ানী বিরোধী দাবী দাওয়া একান্তভাবেই ধর্ম্মভিত্তিক। ঐ সকল দাবীদাওয়া মানিয়া লওয়া হইলে এছলামের বিরূপ সমালোচনার পথ অধিকতর সুগম হইয়া যাইবে। কারণ এই আন্দোলন যাহাদিগকে "কাফের" ঘোষণার দাবী করা হইয়াছে তাঁহারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে "মুসলমান" বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য।

কোন কোন মহল যখন কাদিয়ানী বিরোধী দাবীদাওয়া প্রত্যাখ্যানের সোপারেশ করেন তখন পরিস্থিতি বিবেচনার পর সরকার পক্ষ হইতে কোন কিছু ঘোষণা করা হইয়াছিল কি না সে সম্পর্কে আদালতের এক প্রশ্নের জওয়াবে খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন: "পরিস্থিতি এতদূর জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল যে, দাবীদাওয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া সরকারের পক্ষ হইতে কোন কিছু ঘোষণা করা হইলে আরও অধিক জীবননাশের কারণ ঘটিত।" খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন: "হয়তো আরও অধিক ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তের বিনিময়ে আন্দোলন দমন করিয়া যথাসময়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইত। কিন্তু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের আহ্বানেই আমি অবাঞ্ছিত রক্তক্ষয় বন্ধের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এতৎসত্বেও যাহা ঘটিয়াছে তজ্জন্য আল্লার বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হইতে পারি না। তবে আমি যদি অন্যায় নীতির অনুসরণ করিয়া দেশকে ধর্ম্মীয় যুদ্ধের মুখে ঠেলিয়া দিয়া থাকি তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই তজ্জন্য আমাকে ইহকাল এবং পরকালে শাস্তি প্রদান করিবেন।"

খওয়াজা নাজিমুদ্দীন বলেন, "চৌধুরী জাফরুল্লাহ খানকে মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত করা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম পাওয়া সম্ভব হইবে না" এরূপ কোন কথা তিনি কাহারও নিকট বলেন নাই।

(দৈনিক আজাদ, ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৬০)।

প্রাদেশিক সালানা জলসা এবং প্রাদেশিক শুরা কমিটির অধিবেশন

আহমদী ভ্রাতা-ভগিনিগণ এবং জমাতের শুভাকাঙ্খী সকলের অবগতির জন্য নিবেদন করা হইতেছে যে, ঢাকার ৪ নং বক্সিবাজার রোডে অবস্থিত দারুত-তবলীগ ভবনে আগামী ৫ই মার্চ্চ, ১৯৫৪ ইংরেজী মোতাবেক ২১শে ফাল্গুন রোজ শুক্রবার দিবস পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার শুরা কমিটির বার্ষিক অধিবেশন এবং ৬ই ও ৭ই মার্চ্চ, ১৯৫৪ ইং মোতাবেক ২২শে এবং ২৩শে ফাল্গুন ১৩৬০ বাংলা রোজ শনি ও রবিবার দিবসদ্বয়ে সালানা জলসার অধিবেশন হইবে।

শুরা কমিটির অধিবেশনে পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমনে আহমদীয়ার বার্ষিক হিসাব নিকাশ এবং আগামী বৎসরের বাজেট সহ বার্ষিক কার্য্যক্রম পেশ করা হইবে। উহাতে মাত্র শাখা আঞ্জুমান সমূহের প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটারী সাহেবগণ অথবা তাঁহাদের স্ব স্ব আঞ্জুমনের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ যোগদান করিতে পারিবেন। শুরা কমিটির কার্য্যসূচী এবং বার্ষিক হিসাব নিকাশ ও বাজেট ইত্যাদি সভাস্থলে বিতরণ করা হইবে।

৬ই এবং ৭ই মার্চ্চে নির্দ্ধারিত সালানা জলসার অধিবেশনে সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন। ইহাতে ইসলাম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং দেশ বিদেশের অভিজ্ঞ মোসলেম মিশনারীগণ কিরূপে ইসলামের নীতি প্রয়োগে জগতের বর্ত্তমান সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান হইতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কিরূপে মুসলমান ও অমুসলমান নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষিত হইতে পারে এবং জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সমান সুযোগ হইতে পারে, কিরূপে ইসলামের শিক্ষা প্রয়োগে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এবং জাতিতে জাতিতে সকল রেষারেষি এবং দ্বেষ-বিদ্বেষের অবসান হইয়া বিশ্বময় এক শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সকল মতাবলম্বী শ্রোতৃবর্গের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অনুগ্রহপূর্ব্বক মফস্বলের আগন্তুকবৃন্দ স্ব স্ব বিছানা, বদনা এবং মশারী সঙ্গে আনিবেন। আঞ্জুমানের পক্ষ হইতে বিনা ব্যয়ে সমস্ত মেহমানদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হইবে (ইনশা আল্লাহ)।

মহিলাদের জন্য সভাস্থলে পর্দ্দার ব্যবস্থা করা হইবে। নিবেদন ইতি—

খাকছার—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম
সেক্রেটারী মাল, পূঃ পাঃ প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া

নভেম্বর মাসের আহমদীপাড়া মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিপোর্ট

এই মাসে মজলিশের খোদ্দামরা ব্যক্তিগতভাবে মোট ৪২ জনকে তবলীগ করেছে, মৌখিক ও ইস্তাহারাদির দ্বারা। উহাদের মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষক উল্লেখযোগ্য। মসজিদুল মাহদীতে মোট তিনটি মিটিং হইয়াছে। খোদ্দামদের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে জমাতের প্রতি খোদ্দামদের দায়িত্ববোধ জাগরিত করা সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হয়। আহমদীপাড়া একজন গরীব বিধবার ঘর উঠাইবার জন্য ৫৲ টাকা সাহায্য করা হয় এবং কলেজের একজন গরীব মেধাবী ছাত্রকে খোদ্দামদের মধ্য হইতে চাঁদা তুলিয়া ১২৲ টাকা সাহায্য করা হয়। উক্ত বিধবা মেয়ের ঘরের চালও খোদ্দামরা মিলিয়া উঠাইয়া দেয়।

নিবেদক—শাহীদুর রহমান
কায়েদ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া,
আহমদীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.